সংখ্যা ০২, সাল ২০১৯ ইং

হাদিস স্টাডিজ

হুদাইবিয়ার সন্ধির ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
প্রফেসর ড. মোঃ নাজমুল হক নাদভী

মহানবী (স) এর ক্ষমা ও মহানুভবতা
ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম

হাদিস অধ্যয়নে অগ্রাধিকার নির্ণয়ে পরামর্শ
শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (স) এর ভূমিকা
মো: তোফাজ্জল বিন আমীন

গৃহকর্মীদের সাথে মহানবী (স) এর আচরণ
নাজমুল হুদা সোহেল

বাংলা ভাষায় রচিত হাদিস শাস্ত্রের
তত্ত্ব ও ইতিহাসমূলক গ্রন্থ পরিচিতি
আবু ছালেহ মুহাম্মদ ইউসুফ

হাদিসের আলোকে নৈতিক চরিত্র
এইচ.এম. মিজানুর রহমান

সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ
الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ
International Islamic University Chittagong

হাদিস স্টাডিজ

হাদিস বিভাগের একটি প্রকাশনা

সংখ্যা ০২, সাল : ২০১৯ ইং

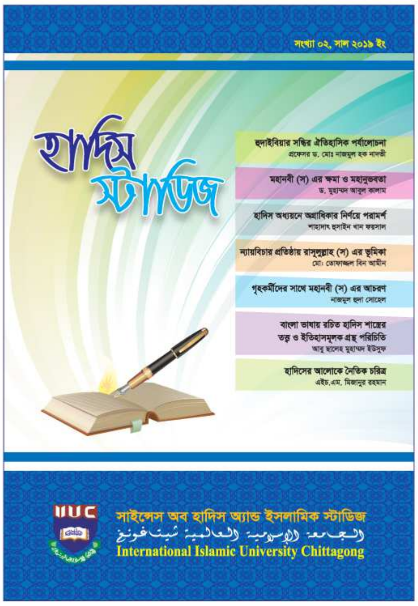

সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ

الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ

International Islamic University Chittagong

www.iiuc.ac.bd/shis

হাদিস স্টাডিজ

সংখ্যা ০২, সাল : ২০১৯ ইং

উপদেষ্টা
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শাফী উদ্দিন মাদানী

সম্পাদক
মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন

নির্বাহী সম্পাদক
নাজমুল হুদা সোহেল

সম্পাদনা পর্ষদ
প্রফেসর ড. মো: নাজমুল হক নাদভী
ড. মোহাম্মদ আবুল কালাম
মুহাম্মদ বেলাল মাদানী
মুহাম্মদ সাইয়্যেদ নূর আল আযহারী

সম্পাদনা সহযোগী
সা'দ বিন আবদুর রউফ
ফয়সাল আহমদ
সুমাইয়া খানম

প্রকাশনায়
সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম-৪৩১৮।
ফোন : ০৩০৪-২৫১১৫৬-৬০
মোবাইল : ০১৭১২-৬৭৩০৯৪, ০১৮১৫-৮১১৩৬৭
ওয়েবসাইট : www.iiuc.ac.bd/shis
ফেসবুক : www.facebook.com/shis.iiuc/

প্রকাশকাল
মে ২০১৯ ইংরেজি
রমাদান ১৪৪০ হিজরি
বৈশাখ ১৪২৬ বাংলা

মুদ্রণ
INVENTION
চকবাজার, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৮১৯-৯৯৫৭৯৯

মূল্য : ৫০ টাকা

সম্পাদকীয়

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, সলাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রতি।

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদিস ছাড়া কুরআনকে বুঝা যায় না। রাসুল (স) এর জীবন, কর্ম, মানবতা, শিষ্টাচার, ধৈর্য্য, সত্যের প্রতি আপোষহীনতা, তাকওয়া, বিচারবোধ, নম্রতা ইত্যাদি হাদিস ছাড়া জানা সম্ভব নয়। তেমনি দৈনন্দিন ইবাদতের পদ্ধতি হাদিস ছাড়া জানা অসম্ভব। কোন ওয়াক্তে কত রাকাত নামাজ, নামাজ কিভাবে আদায় করতে হয়, সেজদা কয়টি হবে এসব কিছু হাদিস ছাড়া জানা সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনেই হাদিস অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া আছে। "যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসুলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে (আহযাবঃ২১)"। "রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক (হাশরঃ৭)"। হাদিসে রাসুল (স) ব্যতীত সঠিকভাবে ইসলাম বুঝা অসম্ভব বিধায় হাদিসের অধ্যয়ন, অন্বেষণ, গবেষণা ও হাদিস অনুযায়ী নিজের পার্থিব জীবন পরিচালনা করা প্রতিটি মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব।

কালের পরিক্রমায় হাদিসে রাসুলের (স) অধ্যয়ন ও গবেষণার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ। 'হাদিস স্টাডিজ' ম্যাগাজিন অত্র বিভাগেরই একটি বাৎসরিক প্রকাশনা। 'হাদিস স্টাডিজ' সম্মানিত পাঠকদের হাদিসের অধ্যয়ন, অন্বেষণ ও গবেষণার প্রতি অনুপ্রেরণা যোগাবে এবং কুরআন সুন্নাহ-র আলোকে পথ চলার পাথেয় হিসেবে কাজ করবে। প্রকাশনাটিতে শিক্ষক ও গবেষকদের লেখার পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা ছাপা হয়েছে। কারণ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে লেখালেখি ও গবেষণাকর্মে পারদর্শী করে তোলা এই ম্যগাজিনের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। এবারের সংখ্যায় সমসাময়িক বিষয় সমূহের পাশাপাশি হাদিস ও সুন্নাহ বিষয়ক লেখাগুলোকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য সম্পাদনা পরিষদ লেখকমন্ডলীর লেখা সমূহে খুব বেশি হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেননি। তাই এতে প্রকাশিত সকল লেখার দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখকগন বহন করবেন।

সহকর্মী ও হাদিস বিভাগের শিক্ষার্থীদের সার্বিক অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় ম্যাগাজিনটি আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ তা'আলা হাদিসে রাসূলের (স) প্রচার ও প্রসারে আমাদের প্রতিটি প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

সম্পাদক
'হাদিস স্টাডিজ'

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

০১। হুদাইবিয়ার সন্ধির ঐতিহাসিক পর্যালোচনা - প্রফেসর ড. মোঃ নাজমুল হক নাদভী ০৫
০২। মহানবী (স) এর ক্ষমা ও মহানুভবতা - ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম ১৫
০৩। হাদিস অধ্যয়নে অগ্রাধিকার নির্ণয়ে পরামর্শ - শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল ১৮
০৪। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (স) এর ভূমিকা - মো: তোফাজ্জল বিন আমীন ২০
০৫। গৃহকর্মীদের সাথে মহানবী (স) এর আচরণ - নাজমুল হুদা সোহেল ২৩
০৬। আদর্শ না তরবারি ? - মারিয়া বিনতে ফারুক ২৬
০৭। বাংলা ভাষায় রচিত হাদিস শাস্ত্রের তত্ত্ব ও ইতিহাসমূলক গ্রন্থ পরিচিতি - আবু ছালেহ মুহাম্মদ ইউসুফ ২৮
০৮। দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা : যৌক্তিকতা - খন্দকার আব্দুল গাফ্ফার ৩২
০৯। হাদিসের আলোকে নৈতিক চরিত্র - এইচ.এম. মিজানুর রহমান ৩৪
১০। ওরিয়েন্টালিজম : একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ষড়যন্ত্র - উম্মে সালমা ৩৬
১১। প্রতিকার নয় প্রতিরোধে সচেতনতাই কাম্য - তানজিফা ইসলাম নাহিদা ৩৯
১২। আখলাকই শ্রেষ্ঠ সম্পদ - ফাহিমা জান্নাত ৪১
১৩। একটি অতুলনীয় সবর - মো: রাকিবুল ইসলাম ৪২
১৪। মরিচীকা - মু. আবদুল গাফ্ফার হামীম ৪৩
১৫। বিশ্বাসের গুরুত্ব - শাহরিন সুলতানা ৪৪

গল্প

১৬। আহ্বান - রুবাইয়া মাহমুদ ৪৬
১৭। একটি অপ্রস্ফুটিত গোলাপের চির বিদায় ও আমাদের সান্ত্বনা - মো: ইকবাল হাসেন ৪৮
১৮। কুষ্ঠরোগী, অন্ধ ও টেকোর কাহিনী - সংকলিত ৫২
১৯। মায়ের বনবাস - উম্মে সালমা ৫৩

কবিতা

২০। জাগরণের ডাক - ছাবেরা খানম ৫৫
২১। হেরমের তৃষ্ণা - বিনতে ফারুক ৫৫
২২। প্রিয় ক্যাম্পাস - তানজিফা ইসলাম নাহিদা ৫৬
২৩। সুখের তরে - শাহরিন সুলতানা ৫৬
২৪। মানবতা - খাতুনে জান্নাত মুমু ৫৭
২৫। ইসলাম - শাহরিন সুলতানা ৫৭
২৬। মানব জাতি - আবদুল ওয়াদুদ ৫৮
২৭। আমি বলতে চাই - মো: রকিবুল ইসলাম ৫৮
২৮। প্রেরণা - এনামুল হাসান রাকিব ৫৯
২৯। জীবন মানে কি? - শোয়াইব মাহমুদ ৫৯

হুদাইবিয়ার সন্ধি'র ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

প্রফেসর ড. মোঃ নাজমুল হক নাদভী *

হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রেক্ষাপট

ষষ্ঠ হিজরীর শেষের দিকে যিলকদ মাসে আল্লাহর রাসুল (স) তাঁর সাহাবীদের নিকট ঘোষণা করেন যে, তিনি ওমরাহ আদায়ের লক্ষ্যে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন, অতঃপর মুহাজীর ও আনসারদের বড় একটি দল আল্লাহর রাসুল (স)'র সাথে ওমরাহ পালনের সঙ্গী হতে আগ্রহী হলেন এবং তাঁদের সংখ্যা ধীরে ধীরে প্রায় চৌদ্দশতে দাঁড়ালো। আল্লাহর রাসুল (স) পথেই ওমরাহ'র জন্য ইহরামের পোষাক পরিধান করেন এবং কোরবানীর পশুও পাঠিয়ে দেন এই উদ্দেশ্যে যেন মক্কাবাসী আল্লাহর রাসুল (স)'র মক্কাগমনকে যুদ্ধের আগমন মনে না করে এবং শুধুমাত্র তিনি আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যেই আগমন করছেন।

আল্লাহর রাসুল (স) যুল হুলাইফায় অবস্থান কালে খোযাআহ গোত্রের বিশ্‌র বিন সুফয়ানকে মক্কাবাসীর খোঁজ-খবর সংগ্রহ করতে গুপ্তচর হিসেবে পাঠিয়ে দিয়ে যাত্রা শুরু করে গাদীরুল আশ্‌তাত নামক স্থানে পৌছালে আল্লাহর রাসুল (স)'র গুপ্তচর যাকে তিনি পূর্বে পাঠিয়েছিলেন তিনি খবর নিয়ে এলেন এবং বলেন: কুরাইশগণ আপনার বিরুদ্ধে বিশাল সমাগম ঘটিয়েছে, তারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এবং আপনাকে প্রতিরোধ করার জন্য হাবশীদের সমাবেশ ঘটিয়েছে, তারা আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে আপনার আগমন রুখে দিবে। অতঃপর আল্লাহর রাসুল (স) তাঁর সাহাবীদের পরামর্শ চাইলেন। হযরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রাসুল (স) আপনি এই ঘরের (আল্লাহর ঘর) উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন, কাউকে হত্যা করতে বা কারো সাথে যুদ্ধ করতে নয়, অতএব আপনি এগিয়ে যান এবং যে আমাদের প্রতিরোধ করবে তার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করবো এবং তিনি বলেন: আল্লাহর নামে চলুন।

অতঃপর আল্লাহর রাসুল (স) বলেন: আমাদের মধ্যে কে আছে যে তাদের (কুরাইশ) পথ পরিহার করে অন্য পথে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে? বনী আসলাম গোত্রের এক লোক বলেন: আমি পারবো হে আল্লাহর রাসুল (স) অতঃপর তিনি আল্লাহর রাসুল (স) ও তাঁর সফরসঙ্গীদের উপত্যকার একটি সংকীর্ণ সরু পথ দিয়ে রওনা দিলেন এবং কাফেলা হুদাইবিয়া অঞ্চলের নিকটে পৌছালে এখানেও কাফেলাকে থামিয়ে দেওয়া হয়, আল্লাহর রাসুল (স) জিজ্ঞাসা করলেন: কাফেলা থামলো কেন? উত্তরে জানানো হলো যে, এই পথেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর আল্লাহর রাসুল (স) বললেন: আল্লাহর সম্মান প্রদর্শনে তারা যা দাবি করে তাতে আমার সম্মতি আছে, অতঃপর আল্লাহর রাসুল (স) হুদাইবিয়া প্রান্তের ছোট্ট পানির কূপের নিকটে অবস্থান করলে সাহাবীগণ হুদাইবিয়ায় আল্লাহর রাসুল (স)'র নিকট তৃষ্ণার অভিযোগ করলে আল্লাহর রাসুল (স) তাঁর তীরদান থেকে একটি তীর বের করে পানির কূপে গেড়ে দিতে নির্দেশ প্রদান করেন এবং তীরটি পানির মধ্যে গেড়ে দেওয়ার পর ফুল্কী মেরে পানি বেরিয়ে এলো এবং সকলে পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারন করলেন।

এমতাবস্থায় বুদাইল বিন অরকাহ আল-খোযায়ী একদল লোক নিয়ে আল্লাহর রাসুল (স)'র নিকট আগমন করে বললেন যে, আমি কাআব ও আমের বিন লুআইকে হুদাইবিয়া প্রান্তের পানির নিকটে দেখে আসলাম যে, তারা আপনাকে আল্লাহর ঘরে আগমনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মেষপাল নিয়ে ওখানে অবস্থান করেছে, অতঃপর আল্লাহর রাসুল (স) বললেন: আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি, আমরা ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে এসেছি, কুরাইশকে যুদ্ধ নিঃশ্বেষ করে দিয়েছে আর তারা

.

* অধ্যাপক, সাইন্সেস অব হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

যদি তা অস্বীকার করে তাহলে যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ আমি তাদের বিরুদ্ধে আমার দায়িত্ব পালনে লড়াই করে যাব যতক্ষণ না মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করেন। অতঃপর বুদাইল বিন অরকাহ বলেন: আমি আপনার কথা তাদের নিকট পৌঁছে দিব। তারপর বুদাইল বিন অরকাহ কুরাইশদের নিকট গিয়ে আল্লাহর রাসুল (স)'র নিকট শোনা কথাগুলো নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করেন। অতঃপর উরওয়াহ বিন মাসউদ বুদাইল বিন অরকাহ'র কাছ থেকে শোনা আল্লাহর রাসুল (স)'র দাবি নিয়ে কথা বলার লক্ষ্যে আল্লাহর রাসুল (স)'র নিকট যাওয়ার প্রস্তাব করলে তারা তার প্রস্তাব সমর্থন করে আল্লাহর রাসুল (স)'র সাথে কথা বলার দায়িত্ব দেয়।

অতঃপর সে রওনা হলো আল্লাহর রাসুল (স) উরওয়াহ বিন মাসউদকে একই কথা বলেন যা তিনি বুদাইল বিন অরকাহকে ইতিপূর্বে বলেছিলেন-অতঃপর তাঁকে বললো: আপনি কী মনে করেন যে, আপনি স্বজাতির মূলোৎপাটন করতে পারবেন যা কখনো সম্ভব নয়? তাছাড়া আমি এমন কিছু চেহারা ও চরিত্র লক্ষ্য করছি যারা আপনাকে একা রেখে পালিয়ে যাবে। তখন হযরত আবু বক্র (র) বললেন: লাতের পা চুসতে থাকো আমরা তাঁকে রেখে পালিয়ে যাবো!...

উরওয়াহ সেদিকে ফিরে বললো: কে? লোকজন জানালো: আবু বকর। অতঃপর উরওয়াহ বললো: আমার প্রতি যদি তোমার সহযোগিতা না থাকতো তাহলে তুমি পার পেতে না এবং আমি অবশ্যই এর জবাব দিতাম। তারপর সে আল্লাহর রাসুল (স)'র সাথে কথা চালিয়ে যেতে লাগলো এবং যখনই সে আল্লাহর রাসুল (স)'র সাথে কথা বলেছে সে আল্লাহর রাসুল (স)'র দাড়ি ধরে কথা বলছে, হযরত মগীরাহ বিন শু'বাহ আল্লাহর রাসুল (স)'র পাশেই ছিলেন এবং তাঁর হাতে ছিল তরবারী, যখনই সে আল্লাহর রাসুল (স)'র দাড়ি ধরেছে তরবারী'র হাতল দিয়ে তাকে আঘাত করেছে এবং বলেছেন: আল্লাহর রাসুল (স)'র দাড়ি থেকে তোমার হাত দূরে সরিয়ে রাখো। উরওয়াহ সেদিকে ফিরে বললো: এ কে? বলা হলো: মগীরাহ বিন শু'বাহ, অতঃপর সে বললো: হে বিশ্বাসঘাতক তোমার পোষাক থেকে রক্তের দাগ মুছে গেছে বেশি দিন হয়নি।

তারপর উরওয়াহ আল্লাহর রাসুল (স)'র সাহাবীদের প্রতি আড়চোখে দৃষ্টিপাত করলো এবং সে প্রত্যক্ষ্য করলো যে, আল্লাহর রাসুল (স) নাক ঝেড়ে ময়লা অথবা কাঁশি দিয়ে থুথু ফেলেছেন তা সাহাবীদের কারো না কারো হাতেই পড়েছে এবং তা তাঁরা চেহেরায় ও শরীরে মেখেছে, যখন তিনি নির্দেশ প্রদান করেন তাঁরা সকলেই তাঁর নির্দেশ পালনে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে, যখন তিনি অযু করেন তাঁর অযুর ব্যবহৃত পানি নিয়ে তাঁদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যায়, যখন তিনি কথা বলেন তাঁদের কণ্ঠস্বর নীচু হয়ে যায় এবং তাঁরা শ্রদ্ধায় তাঁর প্রতি চোখ তুলে থাকায় না। এই অবস্থা দেখে সে খুবই বিস্মিত হলো এবং কুরাইশদের নিকট গিয়ে তার অনুভূতি প্রকাশ করলো যে, হে আমার স্বজাতি বন্ধুরা! আমি অনেক রাজা-বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হয়েছি, রোম-পারস্যের সম্রাট ও নাজ্জাসীর দরবারে গিয়েছি, আমি কোনো প্রজাকে তাদের রাজাকে এই রকম সম্মান করতে দেখিনি যে রকম মুহাম্মদ (স)'র সাহাবীরা তাঁকে সম্মান করতে দেখিছি। তোমাদের কাছে যে প্রস্তাবই দেওয়া হয় তা তোমরা গ্রহণ করো তাতেই তোমাদের মঙ্গল।

তারপর কুরাইশগণ সুহাইল বিন আমরকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে দুপক্ষের মধ্যে সন্ধিনামা প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসুল (স)'র নিকট প্রেরণ করে এবং তিনি আল্লাহর রাসুল (স)'র নিকট এসে বলেন যে, দুপক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করা হোক। অতঃপর আল্লাহর রাসুল (স) চুক্তিনামা লেখককে (সহীহ মুসলিমের বর্ণনা মতে হযরত আলী সন্ধিনামার লেখক ছিলেন) ডাকলেন অতঃপর আল্লাহর রাসুল (সঃ) বললেন: লিখ "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" তখন সুহাইল আপত্তি জানিয়ে বললো:"রাহমান" সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না সুতরাং তা লেখা যাবে না। তবে লিখ "বিসমিকা আল্লাহুম্মা", মুসলমানগণ বলে উঠলেন: আমরা "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" ব্যতীত কিছুই লিখবো না। অতঃপর আল্লাহর রাসুল (স) বললেন: লিখ "বিসমিকা আল্লাহুম্মা"। তারপর বললেন: এই সন্ধি যাতে সম্মত হয়েছেন মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (বলার) সাথে সাথেই সুহাইল আপত্তি জানিয়ে বললো: যদি আমরা আপনাকে আল্লাহর রাসুল (স) হিসেবে জানতাম তাহলে তো আপনাকে আমরা আল্লাহর ঘরে আগমনে বাধা দিতাম না এবং আপনার সাথে লড়াই করতাম না। তবে লিখ "মুহাম্মদ বিন আবদিল্লাহ" আল্লাহর রাসুল (স) বললেন: তোমরা অস্বীকার করলেও আমি আল্লাহর রাসুল (স)....লিখ "মুহাম্মদ বিন আবদিল্লাহ"(সহীহ মুসলিমের বর্ণনায়: তিনি হযরত আলীকে তা মুছে ফেলতে নির্দেশ দিলে হযরত আলী তা মুছতে অস্বীকৃতি জানান। পরে আল্লাহর রাসুল (স) বললেন: স্থানটি আমাকে দেখিয়ে দাও তাঁকে দেখানো হলে তিনি নিজে মুছে দেন আল্লাহর রাসুল (স) বললেন: আল্লাহর ঘরের পথে আমাদের প্রতিবন্ধকতা করবে না আমরা আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করবো। সুহাইল আপত্তি জানিয়ে বললো: আরব জাতি বলাবলি করবে যে, আমরা চাপের মধ্যে ছিলাম তাই তা হবে না। হ্যাঁ, তবে আগামী বছর তাওয়াফ করা যাবে এবং সন্ধিনামা

সম্পন্ন করা হলো। নিচে সন্ধির প্রধান ধারাগুলো উল্লেখ করা হলো:

১) মুসলমানদের এই বৎসর ওমরাহ পালন ব্যতীত মদীনায় ফিরে যেতে হবে এবং পরবর্তী বৎসর তাঁরা ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করবে, তবে মুসলমানগণ তিন দিন মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন। মক্কায় অবস্থানকালে আত্মরক্ষার জন্য খাপবদ্ধ তরবারী ব্যতীত কোনো অস্ত্র বহন করা যাবে না।

২) কুরাইশদের মধ্য থেকে যদি কেউ তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আশ্রয় নিতে আসে তাঁকে কুরাইশদের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে। তবে মুসলমানদের কেউ ধর্ম ত্যাগ করে মদীনা থেকে পালিয়ে গেলে তারা তাকে ফেরত পাঠাবে না।

৩) প্রতিবেশী বেদুইন গোত্রসমূহ তাদের ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো পক্ষের (মুসলমান বা মক্কাবাসী) সাথে মিত্রতা স্থাপন করতে পারবে। কেউ কোনোরূপ তাদের উপর শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে না।

৪) এই সন্ধি দুই বছরের জন্য বলবৎ থাকবে এবং এই সময়কালে কোনো প্রকার যুদ্ধ বা সামরিক উত্তেজনা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কিছু সীরাত গ্রন্থে সন্ধির সময়কাল দশ বছর উল্লেখ করা হয়েছে যা সঠিক নয়।

আল্লাহর রাসুল (স) শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনেক কঠিন ও কিছু অবাঞ্চিত শর্তও গ্রহণ করলেন। তার মধ্যে অন্যতম শর্ত হলো যে, কুরাইশদের মধ্য থেকে যদি কেউ তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আশ্রয় নিতে আসে তাঁকে কুরাইশদের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে। তবে মুসলমানদের কেউ ধর্ম ত্যাগ করে মদীনা থেকে পালিয়ে গেলে তারা তাকে ফেরত পাঠাবে না। মুসলমানগণ বলতে লাগলেন: সুবহানাল্লাহ! মুসলিম হয়ে আগমন করার পর কিভাবে তাঁকে মুশরিকদের নিকট ফেরত পাঠানো হবে? অতঃপর সবাই আল্লাহর রাসুল (স) কে ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন: আমরা এটি লিখবো? আল্লাহর রাসুল (স) বললেন: "হ্যাঁ, যে আমাদের পক্ষ ত্যাগ করে তাদের নিকট চলে যাবে আল্লাহ তাকে দূর করবে এবং তাদের পক্ষ ত্যাগ করে যে আমাদের কাছে আসবে শীঘ্রই আল্লাহ তাঁর জন্য কোনো পন্থা বের করে দিবেন"।

সন্ধির ফলাফল ও তাৎপর্য

প্রথমত: এই সন্ধি স্থাপন থেকে প্রমাণীত হলো যে, মক্কার পৌত্তলিকরা মুসলমানদের ইতিপূর্বে কখনো প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রহণ করা তো দূরের কথা মুসলমানদেরকে পাত্তাই দেয়নি। তবে এই সন্ধির মাধ্যমে মুসলমানদেরকে সমকক্ষ শক্তি হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। উপরন্ত এই সন্ধি প্রতিবেশী বেদুইন আরব গোত্রগুলোকে আল্লাহর রাসুল (স)'র সাথে সম্পর্ক ও মিত্রতা স্থাপন করার প্রতিবন্ধকতা উঠিয়ে দিয়েছিল। এর ফলে খোযায়াহ গোত্র মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন অপর পক্ষে বনী বকর কুরাইশদের সাথে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

দ্বিতীয়ত: এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর আল্লাহর রাসুল (স) নির্বিঘ্নে চতুর্দিকে ইসলামের দাওয়াত প্রচার-প্রসারের সুযোগ পান এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মদীনার বাইরের বিভিন্ন আরব গোত্রের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন।

তৃতীয়ত: এই সন্ধির শর্তানুযায়ী মক্কা থেকে আগত নবদীক্ষিত মুসলমানদের আল্লাহর রাসুল (স) মক্কাবাসীর নিকট পাঠিয়ে দিতেন, আবু জান্দাল ও তাঁর সাথীরা এর জ্বলন্ত প্রমাণ। তবে এই নবদীক্ষিত মুসলমানগণ যেকোনো প্রকারে প্রহরীদের কাবু করে মক্কায় ফেরত যাওয়ার পরিবর্তে লোহিত সাগরের তীরবর্তী "ইস" নামক এক জঙ্গলে আত্মগোপন করে সেখানে অস্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরা তাঁদের জীবন-জীবিকা পরিচালনার উদ্দেশ্যে সিরিয়া হতে প্রত্যাগত মক্কার ব্যবসায়ী দলের উপর আক্রমণ করে দ্রব্যসম্ভার হস্তাগত করতে লাগলেন যা মক্কাবাসীর জন্য বিপদজনক হয়ে দাড়ায়। পরবর্তী পর্যায়ে তারা আল্লাহর রাসুল (স) কে এই ধারা বাদ দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালে উক্ত ধারা রহিত করা হয়। যার ফলে নবদীক্ষিত মুসলমানগণ মদীনায় আল্লাহর রাসুল (স)'র তত্ত্বাবধানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার সুযোগ পান।

হুদাইবিয়ার সন্ধিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার অব্যাহত প্রচেষ্টা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মক্কা নগরীকে সবার জন্য নিরাপদ শহর হিসেবে গণ্য করেছেন, যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ করেছেন এবং উক্ত শহরে তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যে প্রথম ঘর নির্মাণ করেছেন, যেমন কুরআনে করীমে এরশাদ হচ্ছে

إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين

(নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা বাক্কায় (মক্কা) অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়)।

পৃথিবীর সকল প্রান্তের মানুষের জন্য এই ঘরে আগমন উম্মুক্ত হলেও মুসলমানদের জন্য এই ঘরে আগমন উম্মুক্ত ছিল না। কুরাইশরা এই ঘরে মুসলমানদের আগমনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে যার বর্ণনা কুরআনে করীমে এসেছে, এরশাদ হচ্ছে

يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

(সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও, এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহ্র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা, আল্লাহ্র নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ। বস্তুত তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি তা সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে (সুরা আল-বাকারাহ : ২১৬-২১৭)।

অনুরূপভাবে বাইতুল্লাহর সম্মান রক্ষা ও মক্কা নগরীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষেধ সম্পর্কে কুরআনে করীমে আরো বর্ণীত হয়েছে, এরশাদ হচ্ছে

وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياؤه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.

(আর তাদের মধ্যে এমন কি বিষয় রয়েছে, যার ফলে আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব দান করবেন না। অথচ তারা মসজিদে-হারামে যেতে বাধাদান করে, অথচ তাদের সে অধিকার নেই। এর অধিকার তো তাদেরই রয়েছে যারা পরহেযগার। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সে বিষয়ে অবহিত নয়। আর কা'বার নিকট তাদের নামায বলতে শিস দেয়া আর তালি বাজানো ছাড়া অন্য কোনো কিছুই ছিল না। অতএব, এবার নিজেদের কৃত কুফরীর আযাবের স্বাদ গ্রহন কর। নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফির, তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ, যাতে করে বাধাদান করতে পারে আল্লাহ্র পথে। বস্তুত এখন তারা আরো ব্যয় করবে। তারপর তাই তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে। আর যারা কাফির, তাদেরকে দোযখের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে (সুরা : আল নাস : ৩৫-৩৬)।

অতঃপর মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ শুরু করা কখনো সম্ভব নয়, তবে কুরাইশরা যদি মুসলমানদের আগমনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং মসজিদে-হারামে যেতে বাধাদান করে তখন বাধাদানকারী ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ মাসসমূহেও যুদ্ধের অনুমোদন রয়েছে তা সত্ত্বেও আল্লাহর রাসুল (স) ও তাঁর সাহাবীগণ হুদাইবিয়ায় যুদ্ধে আগ্রহী ছিলেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে মসজিদে-হারামে আগমনের অবরোধ ভেঙ্গে শুধুমাত্র ওমরাহ পালনে ইচ্ছুক ছিলেন। মুসলিমগণ মুহরিম (ইহরাম পরিহত) ছিলেন এবং তাঁরা কুরবানীর পশুও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও কুরাইশরা যখন তাঁদের আগমনের সংবাদ পেল শক্তিপূর্বক তাঁদের রুখতে প্রস্তুতি নিল এবং মুসলমানদের সামনে একদল যোদ্ধা দাঁড় করিয়ে দিল। আল্লাহর রাসুল (স) ভালোভাবে জানতেন পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশে বাধাসৃষ্টিকারী এই যোদ্ধাদের হটিয়ে পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশের অধিকার ও শক্তি দুটোই তাঁর রয়েছে। তবে তাঁর দৃষ্টি সর্বদা শান্তির প্রতি নিবদ্ধ বিধায় তিনি অন্য পথ গ্রহণ করলেন যাতে কুরাইশদের মুখোমুখী না হতে হয়, তাঁর সাহাবীদের কেউ তাঁকে এক কঠিন ও সঙ্কীর্ণ রাস্তার পথ দেখালেন যা হুদাইবিয়া অঞ্চল হয়ে পবিত্র মক্কা নগরী'র দিকে প্রসারিত, অথচ এখানেও কুরাইশরা তাঁদের বিরুদ্ধে মসজিদে-হারামে আগমনে বাধা সৃষ্টি করল। এখানে আল্লাহর রাসুল (স)'র সেই অপূর্ব বাণী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, আল্লাহর রাসুল (স) এরশাদ করেন

يا ويح قريش !! لقد أهلكتهم الحرب

"ধ্বংস হে কুরাইশ!! তোমাদেরকে তো যুদ্ধ নিঃশ্বেষ করে দিয়েছে"। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই রকম অবাঞ্চিত ও কঠিন শর্ত মেনে নেয়ায় মুসলমানদের রাগ চরমে পৌছেঁ যায় বরঞ্চ কেউ কেউ আল্লাহর রাসুল (স)'র নির্দেশ পালনে ইচ্ছুক ছিল না। তখন আল্লাহর রাসুল (স) দুঃখ ও রাগ করে তাঁর স্ত্রী উম্মে সালমা'র তাবুতে প্রবেশ করে বলেন " মানুষ ধ্বংস হয়ে

যাবে মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে যারা তাঁদের নবীর নির্দেশ অমান্য করবে" অতঃপর সূরা 'আল-ফাত্‌হ' অবতীর্ণ হলো এবং হুদাইবিয়া অঞ্চলে যে শান্তি প্রতিষ্ঠা হলো তাতে রয়েছে মুসলমানদের জন্য বড় বিজয় এবং উক্ত শান্তি প্রতিষ্ঠাকে কুরআনে করীমে 'প্রকাশ্য বিজয়' বলে বর্ণনা করা হয়, এরশাদ হচ্ছে

إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.

(নিশ্চয় আমি আপনার জন্যে একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট। যাতে আল্লাহ্ আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিসমসূহ মার্জনা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন (সূরা আল-ফাতহ:০১)।

হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধনীতি ও আদর্শ আমরা শিখতে পারি যা নিম্নরূপ:

১) যতদূর সম্ভব শত্রুর সাথে যুদ্ধ এড়িয়ে চলা এবং যুদ্ধে জড়ানোর সম্ভবপর সকল বিকল্প পথ অবলম্বল করা প্রয়োজন। যেমন আল্লাহর রাসুল (স) এরশাদ করেছেন "হে মানব জাতি তেমরা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার বাসনা করো না আল্লাহর কাছে নিরাপদে থাকার প্রার্থনা করো। তবে শত্রুর সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে গেলে ধৈর্য ধারণ করো এবং জেনে রেখো তরবারীর ছায়াতলেই জান্নাত নিহিত"।

২) শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে সম্ভবপর সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করা তাতে নিজেদের সামান্য অসম্মান হলেও যদি তা মেনে নেয়া সম্ভব হয়। যেমন আল্লাহর রাসুল (স) হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের জোরালো আপত্তি সত্ত্বেও বেশকিছু অসম শর্তসমূহ শান্তি- প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মেনে নিয়েছিলেন।

৩) রক্তপাত এড়িয়ে যেতে সকল পন্থা গ্রহণ করা যদিও তা মুসলিম সেনাবাহিনীর মেনে নিতে কষ্ট হয়।

৪) অবশ্যই শান্তিময় জীবন-যাপন রণাঙ্গনের রক্তপাতের উপর সব সময় সকল যুগে প্রধান্য পাবে।

৫) রক্তপাত ও যুদ্ধ এড়াতে শত্রুর সাথে শান্তি- চুক্তি করা ইসলামে শুধু বৈধ নয় উত্তমও বটে।

৬) শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অথবা দুপক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত শান্তির প্রতিনিধিদের হত্যা শান্তি প্রক্রিয়াকে বন্ধ করে দেয় এবং প্রতিনিধিদের হত্যার কারণে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। যেমন আল্লাহর রাসুল (স) হুদাইবিয়া অঞ্চলে সমগ্র মুসলমানদের পক্ষ থেকে বায়আত 'অঙ্গিকার' গ্রহণ করেন যখন কুরাইশ কর্তৃক আল্লাহর রাসুল (স)'র প্রতিনিধি হযরত উসমান (র) হত্যার সংবাদ প্রচারিত হলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কুরাইশদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে হযরত উসমান (র)'র আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের কারণে কুরাইশদের মাঝে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল বিধায় আল্লাহর রাসুল (স) তাঁকে দূত হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন।

হুদাইবিয়া সন্ধির রহস্যসমূহ

১) হুদাইবিয়ার সন্ধিকে মক্কা বিজয়ের চাবি হিসেবে গণ্য করা হয়। অনেক ইসলামী গবেষকদের মতে হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে মূলত মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসুলকে মক্কা বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দিলেন। এটি মহান রাব্বুল আলামীনের চিরাচরিত নীতি যে, কোনো বিষয় প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদিকে ভূমিকারূপে প্রকাশ করেন। পরে সঠিক সময়ে মূল বিষয়ের অবতারণা করেন, যেন উক্ত বিষয় সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মধ্যে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয় যা দাওয়াতের মূল পদ্ধতিও বটে।

যদিও সাহাবীদের অনেকেই এর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারেননি, কারণ ভবিষ্যত তাঁদের সম্মুখে উহ্য ছিল যা আল্লাহর রাসুল (স)'র সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট ছিল। তবে কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সাহাবীদের নিকটও বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। পাশপাশি এই সন্ধির মাধ্যমে সাধারণ জনগণ নিরাপত্তা অনুভব করে এবং মুসলমানরা অমুসলিমদের সাথে মিশে যায়, তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন, তাদেরকে কুরআনে করীম শুনান, তাদের সাথে ইসলাম সম্পৃক্ত বিষয়াদি নিয়ে খোলা মনে পর্যালোচনা করার সুযোগ পান এবং যাঁরা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এতদিন নিজেদের ইসলাম গ্রহণ প্রকাশ করেননি তাঁরাও প্রকাশ্য হন। ইব্‌ন শিহাব যুহরী থেকে ইব্‌ন হিশাম ও ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে ইসলামে এর চেয়ে বড় বিজয় সাধিত হয়নি। এর পূর্বে সর্বস্থানে যুদ্ধ বিরাজমান ছিল, উক্ত সন্ধির মাধ্যমে যুদ্ধাবস্থার সমাপ্তি ঘটে, সাধারণ জনগণ নিরাপত্তার স্বাধ উপলব্ধি করেন এবং মুসলমানগণ যেখানেই অমুসলিমদের সাথে মিলিত হতেন ইসলামের সৌন্দর্য্য তাদের সামনে তুলে ধরতেন, অমুসলিমরা বুঝে-শুনে ইসলামের ছায়ায় প্রবেশ করতে থাকে, এই দুবছরে ইসলামে প্রবেশকারীদের সংখ্যা ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের চেয়ে কম নয় বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে বেশি প্রতীয়মান হয়"। তাই কুরআনে করীম উক্ত সন্ধিকে "সুস্পষ্ট বিজয়" বলে উল্লেখ করেছে।

এরশাদ হচ্ছে

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.

(আল্লাহ্ তাঁর রাসুলকে সত্য স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তক মুন্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অতঃপর তিনি জানেন যা তোমরা জান না। এছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিজয় (আল ফাতহ : ২৭)

২) মহান রাব্বুল আলামীন এই সন্ধির মাধ্যমে অহী ও মানবকৌশলের মধ্যকার পার্থক্য উন্মোচন করেন, আল্লাহর প্রেরিত রাসুলের শক্তি ও প্রতিভাবান চিন্তানায়কের প্রজ্ঞার মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট করেন, পার্থিব কারণসমূহের উর্ধ্বের ঐশী প্রত্যাদেশ ও পার্থিব কারণসমূহে নিহীত তৎপরতার মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করেন যে, মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর নবীকে পৃথিবীর সকল চিন্তানায়কের বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার উর্ধ্বের অবস্থানে বিজয় প্রদানের ইঙ্গিত দিয়ে বলেন: وينصرك الله نصرا عزيزا (আল্লাহ আপনাকে এক বিরল বিজয়ে ভুষিত করবেন)। সুতরাং অমুসলিমরা যা শর্ত দিয়েছে আল্লাহর রাসুল (স) সবই মেনে নিয়েছেন, যার মধ্যে কিছু অযৌক্তিক ও অসম শর্তও ছিল যা মেনে নেওয়ার কারণে হযরত উমরের মতো বায়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাময় প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন: আমি আল্লাহর রাসুল (স) তাঁর অবাধ্য নই এবং তিনিই আমার সাহায্যকারী। তিনি হযরত উসমানকে মক্কায় কুরাইশদের সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে নিজ প্রতিনিধিরূপে প্রেরণের সময় যে উপদেশ দিয়েছিলেন এতে আরো স্পষ্ট হয় এবং তিনি মক্কার মুসলিম নর-নারীদের নিকট তাঁর আগমন বার্তা শুনিয়ে তাদেরকে বিজয়ের সুসংবাদ প্রদানের নির্দেশ দেন।

স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানরা আল্লাহর রাসুল (স)'র এমন অসম সন্ধি সম্পাদনে হতবাক হয়ে পড়েন যা তাঁদের চিন্তা ও বুদ্ধিতে বুঝে উঠতে পারেননি এবং অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীগণ এই সন্ধিকে কুরাইশদের কাছে আল্লাহর রাসুল (স) তথা বাতিলের কাছে সত্যধর্মের এবং মিথ্যার নিকট সত্যের আত্মসর্মপণ বলে ধারণা করেছিলেন বিধায় বারবার আল্লাহর রাসুল (স) কে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। অতঃপর আল্লাহর রাসুল (স) এই সন্ধিকেই মুসলমানদের মহা বিজয় হিসেবে আখ্যা দিয়ে সূরা আল-ফাতহ পাঠ করে শুনানোর পর সাথে সাথেই তাঁদের সকল উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা কেটে যায় এবং সকলেই আল্লাহর রাসুল (স)'র সম্পাদিত সন্ধির প্রতি আনুগত্য ও সম্মতি প্রদান করে ধন্য হন।

তবে বিশেষকরে সন্ধির এই ধারা"কুরাইশদের মধ্য থেকে যদি কেউ তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আশ্রয় নিতে আসে তাঁকে কুরাইশদের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে। তবে মুসলমানদের কেউ ধর্ম ত্যাগ করে মদীনা থেকে পালিয়ে গেলে তারা তাকে ফেরত পাঠাবে না" ধারা সম্পর্কে কুরাইশ প্রতিনিধি সুহাইল বিন আমরের সাথে আল্লাহর রাসুল (স)'র ঐকমত্য পোষণ করা সাহাবীদের মধ্যে দারুণ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে এবং সেই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আরো বৃদ্ধি পায় যখন আবু জান্দাল (কুরাইশ প্রতিনিধি সুহাইল বিন আমরের পুত্র) ইসলাম গ্রহণ করে মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় আগমন করেন। অতঃপর কুরাইশ প্রতিনিধি সুহাইল বিন আমর আল্লাহর রাসুল (স)'র দিকে এগিয়ে এসে আল্লাহর রাসুল (স)'র জামার অগ্রভাগ ধরে বলতে লাগলো: " হে মুহাম্মদ (স) এ তোমার নিকট আসার পূর্বে আমার ও তোমার মধ্যে সন্ধি সম্পন্ন হয়েছে, আল্লাহর রাসুল (স) বললেন তুমি সত্য বলেছ এবং তাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহর রাসুল (স)'র জামা ধরে ঝাঁকি দিতে লাগলো, অন্যদিকে আবু জান্দাল চিৎকার করে বলতে লাগলেন: হে মুসলিমগণ আমার দ্বীনের বিষয়ে পরীক্ষায় ও শাস্তি প্রদানের জন্য কী আমাকে মুশরিকদের প্রতি ফিরিয়ে দেয়া হবে? অতঃপর আল্লাহর রাসুল (স) বললেন:"হে আবু জান্দাল তুমি ধৈর্য ধারণ করো এবং মনে রাখো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমার এবং তোমার সাথে আরো যারা অসহায় রয়েছে তাদের জন্য একটি পন্থা অবশ্যই বের করবেন, আমরা তাদেরকে অঙ্গিকার দিয়েছি অতঃপর আমরা অঙ্গিকার ভঙ্গ করতে পারি না" অতঃপর তাঁকে ফিরিয়ে দেয়া হলো এবং আল্লাহর রাসুল (স)'র সাহাবীগণ এই দৃশ্য দেখে খুবই মর্মাহত হলেন। তারপর কী হলো? আল্লাহর রাসুল (স)'র মদীনা পৌছার পর আবু বুসাইর নামের আরো একজন কুরাইশ ইসলাম গ্রহণ করে মদীনা আগমন করলে কুরাইশ তাঁকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য দুজন লোক পাঠায়, অতঃপর তাঁকেও ফিরিয়ে দেয়া হয়। ইতিমধ্যে আবু বুসাইরকে নিয়ে কুরাইশদ্বয় জুল-হুলাইফাহ নামক স্থানে পৌছলে আবু বুসাইর তাদের অবচেতনে একজনের তরবারী ছিনিয়ে নিয়ে তাকে হত্যা করতে সক্ষম হলে অপর জন পালিয়ে যায়, অতঃপর আবু বুসাইর আল্লাহর রাসুল (স)'র নিকট ফিরে এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসুল (স) আপনি আপনার দায়িত্ব পূর্ণ করেছেন, আপনি আমাকে তাদের নিকট ফিরিয়ে দিয়েছিলেন অতঃপর আল্লাহ আমাকে তাদের

কাছ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও আল্লাহর রাসুল (স) সন্ধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে অপারগতা প্রকাশ করলে তিনি মদীনা থেকে বের হয়ে সমুদ্রতীরবর্তী স্থানের দিকে রওনা দিলেন, ইতিপূর্বে সেখানে আবু জান্দাল অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর সেই স্থান মক্কা ফেরত নবমুসলিমদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হলো এবং মক্কাবাসীর কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে সে মক্কা ত্যাগ করে আবু বুসাইর ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে মিলিত হন এবং এভাবে সেখানে এক বড় বাহিনী গড়ে উঠলে তাঁরা মক্কার বণিকদল সিরিয়া হতে মক্কায় প্রত্যাবর্তনকালে তাদেরকে আক্রমণ করে তাদের হত্যা করে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিতে লাগলেন। অতঃপর মক্কাবাসী তাদের আচরণে অতীষ্ট হয়ে সন্ধির এই ধারা বিলুপ্ত করে তাঁদের মদীনায় অন্তর্ভুক্ত করতে অনুরোধ জানালে তাঁদেরকে মদীনায় ফিরিয়ে আনা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই আবু জান্দাল মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর পিতার জন্য আল্লাহর রাসুল (স)'র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাঁকে আশ্রয় প্রদান করা হয় এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ইয়ামামাহ'র যুদ্ধে শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন।

৩) হুদাইবিয়ার সন্ধির রহস্যসমূহের অন্যতম হলো যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মক্কা বিজয়কে তাঁর রাসুল (স)'র জন্য যুদ্ধ ও রক্তপাতের বিজয় নয় বরঞ্চ শান্তি ও রাহমতের বিজয়রূপে নির্ধারণ করেছেন, যে বিজয়ে সাধারণ জনগণ প্রতিযোগিতার সাথে তাঁর দ্বীনের দিকে এগিয়ে আসবে এবং আরবের প্রতিটি গোত্র-জাতি ইসলামের ছায়াতলে নিজ ধর্ম, জীবন, সম্মান, সম্পদ ও চিন্তা-চেতনার নিরাপত্তা উপলব্ধি করে দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে। যেখানে তাদেরও গ্রহণ করা হবে যারা অতীত জীবনে আল্লাহর রাসুল (স) কে লাঞ্চিত করেছে, অপমান করেছে, নিজের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করেছে এবং প্রবাসেও তাঁকে নিঃশেষ করে দিতে সর্বাত্নক প্রচেষ্টা করেছে এবং তাঁরাও আল্লাহর রাসুল (স)'র প্রতি শান্তি বার্তা নিয়ে আসবে অতঃপর তাঁর কাছে আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামের হাতকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করবে, অনুতপ্ত হয়ে কুরাইশ তাঁর মাঝে অনুপ্রেরণা ও জাগ্রত অনুভূতির সন্ধান করবে।

বিভিন্ন আরব উপ-জাতির বিরুদ্ধে অভিযান

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, হুদাইবিয়া'র সন্ধির পর ইসলামী দাওয়াত নতুন একটি পর্যায়ে পদার্পণ করে। হুদাইবিয়া'র সন্ধির পর আল্লাহর রাসুল (স) ও মুসলমানগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্তভাবে ইসলামের প্রচার-প্রসারের সুযোগ পান এবং আল্লাহর রাসুল (স) বিভিন্ন আরব গোত্র ও উপজাতিদের ইসলামের দাওয়াতের অংশ হিসেবে আরবাঞ্চলে বিস্তৃত বিভিন্ন আরব গোত্র ও উপজাতিদের প্রতি ইসলামের সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানান, অতঃপর যারা এই আহবানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয় তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সাহাবী'র নেতৃত্বে সপ্তম হিজরী জুড়ে সতেরটি অভিযান পরিচালনা করেন। অনুরূপভাবে ঐ সময়ে আল্লাহর রাসুল (স) ইসলামের আহবান জানিয়ে তৎকালীন বিশ্বের বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর প্রতিও পত্র পাঠান।

ইতিহাসবিদ ও সীরাতবিশারদ ইব্‌ন সাআদ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসুল (স) ষষ্ঠ হিজরী'র জিলহজ্ব মাসে হুদাইবিয়াহ থেকে ফিরে তৎকালীন বিশ্বের বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ'র নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করেন এবং তাদের পত্র লিখেন, অতঃপর আল্লাহর রাসুল (স) কে বলা হলো যে, রাজা-বাদশাহগণ সীল স্বাক্ষর ব্যতীত পত্র পাঠ করেন না, তখন আল্লাহর রাসুল (স) রূপার একটি আংটি বানিয়ে নেন যাতে তিন লাইনে محمد رسول الله অংকিত ছিল এবং পত্র লিখে তা দিয়ে সীলযুক্ত করতেন। অতঃপর সপ্তম হিজরী'র কোনো একদিন আল্লাহর রাসুল (স)'র পত্র নিয়ে ছয়জন প্রতিনিধি রওনা হন যাঁদের প্রত্যেকের প্রেরিত জাতির ভাষাজ্ঞান ছিল।

আল্লাহর রাসুল (স) হযরত আমর বিন উমাইয়্যাহ আল-যামরীকে প্রথম প্রতিনিধি হিসেবে হাবশাহ'র শাসক নাজ্জাশী'র নিকট প্রেরণ করেন, অতঃপর তিনি আল্লাহর রাসুল (স)'র পত্র গ্রহণ করে অতি সম্মান ও মর্যাদার সাথে তাঁর মাথায় রাখেন এবং নিজ আসন থেকে নেমে বিনয়ের সাথে মাটিতে বসে পড়েন, তারপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করে কালিমা শাহাদাহ উচ্চারণ করে বলেন:"আমি যদি তাঁর কাছে আসতে পারি তাহলে অবশ্যই আসব"।

তারপর আল্লাহর রাসুল (স) হযরত দিহইয়াহ কালবীকে রোমান সম্রাট হারাকলের নিকট প্রেরণ করেন, হযরত দিহইয়াহ কালবী আল্লাহর রাসুল (স)'র পত্র তার দরবারীর মাধ্যমে হস্তান্তর করেন, অতঃপর হারাকাল অনুবাদকের সাহয্যে পত্র পাঠ করেন, তাতে লেখা ছিল

بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون.

(পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ (স)'র প থেকে রুমের মহামান্য সম্রাট হারাকালের নিকট প্রেরিত, ইসলাম গ্রহণ করুন শান্তিতে থাকবেন, ইসলাম গ্রহণ করুন আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুন প্রতিদান প্রদান করবেন, আর যদি অমান্য করুন তাহলে আপনার অনুগতদের অপরাধও আপনার উপর বর্তাবে, হে আহ্‌লে কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না, তার সাথে কোনো শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, 'স্বাক্ষী থাক আমরা তো অনুগত)।

ইতিহাসবিদ ও সীরাতবিশারদ ইব্‌ন সাআদ বর্ণনা করেন যে," হারাকাল পত্র পাঠের পর তার দরবারীদের বললো: হে রোমবাসী তোমরা কি তোমাদের সফলতা ও কল্যাণ চাও এবং তোমাদের রাজত্বের অস্তিত্ব ও ঈসা বিন মরয়মের বর্ণীত পথের অনুসারী হিসেবে থাকতে চাও? রোমবাসী বললো: তা আবার কি হে মহামান্য সম্রাট? সে বললো: তোমরা এই আরবী নবীর অনুসারী হও, তারা তখন বন্যপশুর ন্যায় ক্রস উঁচিয়ে দরজার দিকে পালাতে লাগলো। অতঃপর হারাকাল তা দেখে তাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে নৈরাশ হয়ে গেল এবং নিজের জীবন ও রাজত্ব হারানোর ভয় তাকে পেয়ে বসলো, তখন সে তাদেরকে চুপ করিয়ে বললো: আমি তোমাদের পরীক্ষা করে দেখতে চাইলাম তোমরা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে কতটুকু দৃঢ় আছো, আমি তোমাদের পক্ষ থেকে যা দেখেছি তাতে আমি অভিভূত। অতঃপর তারা তাকে আনুগত্যের নির্দশন স্বরূপ সিজদাহ করলো।

তারপর আল্লাহর রাসুল (স) হযরত আবদুল্লাহ বিন হুযাফাহ আল-সাহমীকে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র নিয়ে পারস্যের সম্রাট কিসরা'র নিকট প্রেরণ করেন, তিনি বলেন: আমি তাকে পত্র হস্তান্তর করলে পত্রটি তার সামনে পাঠ করা হয়, তারপর সে পত্র নিয়ে তা টকুরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলে, অতঃপর আল্লাহর রাসুল (স)'র কাছে পারস্যের সম্রাট কিসরা'র আচরণের সংবাদ পৌছলে তিনি বলেন: আল্লাহ তার রাজত্ব টকুরো টুকরো করবে। তারপর পারস্যের সম্রাট কিসরা ইয়েমেনে নিযুক্ত তার গভর্নর বাযানের কাছে পত্রে নির্দেশ প্রদান করে যে, তোমার কাছ থেকে দুজন শক্তিশালী ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির -আল্লাহর রাসুল (স)- নিকট পাঠানো হোক তারা যেন তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। অতঃপর ইয়েমেনের গভর্নর বাযান আল্লাহর রাসুল (স)'র কাছে পত্র নিয়ে দুই ব্যক্তিকে প্রেরণ করে, তারা মদীনায় পৌঁছে আল্লাহর রাসুল (স)'র কাছে বাযানের পত্র হস্তান্তর করলে আল্লাহর রাসুল (স) মুচকি হেসে বলেন: তোমরা আজকে যাও আগামী কাল তোমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি সংবাদ প্রদান করবো, অতঃপর পরের দিন তারা আসলে আল্লাহর রাসুল (স) তাদেরকে বললেন:

أبلغا أن ربي قد قتل ربه كسرى فى هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها صاحبكما

(তোমাদের গর্ভনরকে গিয়ে বলো যে আমার পালনকর্তা তার মালিক কিসরাকে গত রাতে সাত ঘন্টা পূবে হত্যা করেছেন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসুল (স)'র সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণের কারণে তার পুত্রকে তার উপর কর্তৃত্বপরায়ণ করলে সে তার পিতাকে হত্যা করে) অতঃপর বাযানের প্রতিনিধিদ্বয় তার কাছে ফিরে উপরিউক্ত ঘটনার বর্ণনা দিলে বাযান ও ইয়েমেনে অবস্থানরত তাঁর সন্তানেরা ইসলাম গ্রহণ করেন।

অনুরূপভাবে আল্লাহর রাসুল (স) হারিস বিন উমাইর আল-ইয়েযদীকে রোমের পরে গর্ভনর শুরাহবীল বিন আমর আল-গস্‌সানীর নিকট প্রেরণ করেছিলেন, শুরাহবীল বিন আমর তাঁকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে হত্যা করে। হারিস বিন উমাইর ব্যতীত আল্লাহর রাসুল (স)'র কোনো প্রতিনিধি হত্যার শিকার হন নি।

এভাবে আল্লাহর রাসুল (স) আরবাঞ্চলের বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ ও আরব গোত্রপ্রধানদের নিকট ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহবান জানিয়ে প্রচুর প্রতিনীধি ও পত্র প্রেরণ করেছিলেন, যার ফলে তাদের অনেকেই ইসলামের সুন্দর ও নিরাপদ ছায়াতলে এসে সম্মানিত হন, তবে কিছু দূর্ভাগা ইসলাম গ্রহণে ব্যর্থও হয়েছে। অনুরূপভাবে এই সময়ে আল্লাহর রাসুল (স)'র নিকটও বিভিন্ন

অঞ্চলের রাজা-বাদশাহ ও আরব গোত্রপ্রধানগণও প্রতিনিধি প্রেরণ করেন এবং ইতিহাসখ্যাত যোদ্ধা ও বীর খালিদ বিন আল-অলীদ ও বিশিষ্ট আরব কূটনৈতিক আমর বিন আল-আস এই সময়ে ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর রাসুল (স)'র সাহাবীদের তালিকাভূক্ত হয়ে সম্মানিত হন।

এই সময়ের অন্যান্য প্রতিনিধি ও সরায়া'র (যেই যুদ্ধে আল্লাহর রাসুল (স) সশরীরে অংশগ্রহণ করেননি) বিস্তারিত আলোচনা। করা মাগাযী শিরোনামের গ্রন্থে যৌক্তিক নয় বিধায় প্রতিনিধি ও অভিযানের বিষয়টি এখানেই সমাপ্ত করা হলো। তবে প্রতিনিধি ও অভিযান প্রেরণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও এর সুফল এবং উদ্ভাবিত বিভিন্ন শিক্ষা ও উপদেশ নিচে আলোচনা করা হলো:

১) ইসলামী দাওয়াতের নবযুগে পদার্পনের উপকরণ: বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা-বাদশাহ ও আরব গোত্রপ্রধানদের নিকট ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহবান জানিয়ে প্রেরিত প্রতিনিধি ও অভিযান এবং পত্রের আদান-প্রদান আল্লাহর রাসুল (স)'র জীবদ্দশাই ইসলামী দাওয়াতের নতুন যুগের যাত্রা শুরু হয় যা হিজরত পরবর্তী-হুদাইবিয়া'র সন্ধি'র দাওয়াতের পন্থা থেকে কিছুটা ভিন্ন। পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, হিজরতের পর থেকে হুদাইবিয়া'র সন্ধি পর্যন্ত ইসলামী দাওয়াতের পন্থা সঙ্গত কারণেই অনেকটা শান্তিপূর্ণ ও প্রতিরামূলক ছিল যা ঐ সময়ে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের পর্যালোচনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয়। সেই সময়ে (হিজরত পরবর্তী-হুদাইবিয়া'র সন্ধি পর্যন্ত) আল্লাহর রাসুল (স) আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বা আক্রমণ করেননি, অনুরূপভাবে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের পর কেউ ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তার বিরুদ্ধেও কোনো অভিযান পরিচালনা করেননি।

তবে মদীনাবাসী ও কুরাইশদের মধ্যে হুদাইবিয়া'র সন্ধি সম্পাদন হওয়ার পর আল্লাহর রাসুল (স) ও মুসলমানগণ নিজেদের নিরাপত্তার বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিত হলেন, পাশাপাশি কুরাইশদের ষড়যন্ত্র ও অবাঞ্ছিত আচরণ থেকেও মুক্তি পান। অতঃপর আল্লাহর রাসুল (স)'র সামনে ইসলামী দাওয়াতের নতুন যুগে পর্দাপণ করার পথ সুগম হয় এবং তা হলো যে জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছেন (ইসলামী শরীয়াহ'র প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন) সরাসরি এর জন্য কাজ করার সুযোগ পান। যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত সঠিকভাবে পৌছার পরও ঈর্ষা ও বিদ্বেষের কারণে তা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা ও সর্বাত্মক যুদ্ধ করে তাদের ইসলামী শরীয়তের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন।

এই নবযুগের মাধমে আল্লাহর রাসুল (স) বিশ্বপতি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দাওয়াত সমগ্র বিশ্বে পৌছিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের উপযোগী জীবন বিধানরূপে প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ় প্রত্যয়ে মনোনিবেশ করেন। এবং তাঁর মিশন পূরণে যা করণীয় তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হিজরত পরবর্তী-হুদাইবিয়া'র সন্ধি পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালিয়ে গেলেও মুক্ত ও নিরাপদ পরিবেশে এখনো তা অব্যহত রাখার কোনো প্রয়োজন নেই বিধায় আল্লাহ প্রদত্ত বিধান বাস্তবায়নে সরাসরি যুদ্ধে অবতরণ ব্যতীত কোনো পন্থা নেই, যেমন হাদীসে এসেছে" ইসলাম গ্রহণ করো নিরাপদে থাকবে, ইসলাম গ্রহণ না করলে জিযিয়া প্রদান করতে হবে, নয়তো তরবারী ই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে" অর্থাৎ "ইসলাম গ্রহণ,জিযিয়া অথবা তরবারী"এই নীতি নিয়ে আল্লাহর রাসুল (স) ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলেন।

এই যুগে পর্দাপনের পর বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা-বাদশাহ ও আরব গোত্রপ্রধানদের নিকট ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহবান জানিয়ে যে চিঠি-পত্র প্রেরণ করেছিলেন তাতে বেশ কিছু শরয়ী বিধান পরীলক্ষিত হয় তা সংক্ষেপে নিচে আলোচনা করা হলো:

১) আল্লাহ প্রদত্ত যেই বার্তা নিয়ে আল্লাহর রাসুল (স) প্রেরিত হয়েছেন তা কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা গোষ্ঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, আল্লাহর বার্তা নিয়ে দল,মত, কাল ও অঞ্চল নির্বিশেষে সর্বকালের জন্যে সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট প্রেরিত হয়েছেন বিধায় তিনি পৃথিবীর রাজা-বাদশাহ ও শাসকগোষ্ঠীর প্রতি তাঁর দাওয়াত নিয়ে অগ্রসর হন, হযরত আনস বিন মালিক থেকে বর্ণীত যে

أن النبي ﷺ كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى

"আল্লাহর রাসুল (স) কিসরাও কায়সার, নাজ্জাশী ও প্রতিটি স্বৈরশাসককে আল্লাহর প্রতি আহবান জানিয়ে পত্র লিখেন"।

২) আল্লাহর রাসুল (স) যখন এই মর্মে অবগত হলেন যে, রাজা-বাদশাহগণ সীল স্বাক্ষর ব্যতীত পত্র পাঠ করেন না, তখন আল্লাহর রাসুল (স) তিন লাইনে محمد رسول الله অংকিত একটি রূপার আংটি বানিয়ে নেন। উপরিউক্ত ঘটনার আলোকে অধিকাংশ ওলামা-মশায়েখ আঙ্গুলে রূপার আংটি পরিধান করা সুন্নাত মনে করেন যা বৈধ হিসেবে সহজেই প্রতীয়মান হয়।

৩) সত্যদ্বীনের আবির্ভাবের পরও অধিকাংশ আহলে কিতাবদের অবস্থান ক্ষমতার লোভ ও ঈর্ষা-বিদ্বেষের কারণে অভিন্ন, যেমন হারাকাল ও তার অনুগতদের অবস্থান যারা নিজেদেরকে ঈসা বিন মরয়মের দ্বীনের উপর আছে বলে ধারণা করে। প্রথমে হারাকালকে মনে হয়েছিল যে, সে সত্যধর্ম ইসলাম সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করে, পরে যখন ইসলাম গ্রহণে তার জীবন ও রাজত্ব বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, সাথে সাথে নিজের ক্ষমতা ও রাজত্ব রক্ষায় মগ্ন হয়ে পড়ে।

৪) ইসলামী দাওয়াতের প্রচার-প্রসারে কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন সকল সম্ভাব্য পন্থা গ্রহণ করা শুধু বৈধ নয় আবশ্যকও বটে। যেমন ইসলামী দাওয়াতের প্রয়োজনে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর ভাষাজ্ঞান অর্জন করা বাঞ্ছনীয়, সপ্তম হিজরীতে আল্লাহর রাসুল (স) যে ছয়জন প্রতিনিধিকে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর শাসকদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের প্রেরিত জাতির ভাষাজ্ঞান ছিল।

৫) ইসলামী দাওয়াতের জন্য সময় নির্বাচন করাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। উপযুক্ত সময় ব্যতীত ইসলামী দাওয়াতের প্রচার-প্রসারে বিঘ্নতা আসতে পারে তা লক্ষ্য রাখা অতীব জরুরী। যেমন আল্লাহর রাসুল (স) হুদাইবিয়া'র সন্ধির পূর্বে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর শাসকদের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ থেকে বিরত ছিলেন, এবং হুদাইবিয়া'র সন্ধির কারণে যখন মুশরিকদের পক্ষ থেকে বিশেষ করে কুরাইশদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা অনুভব করেন তখনই তিনি ইসলামী দাওয়াতের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি প্রেরণের কাজ শুরু করেন।

মহানবী (স) এর ক্ষমা ও মহানুভবতা

ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম

মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك আল্লাহর রাহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয়ের অধিকারী হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে সরে যেতো। (আল ইমরান : ১৫৯)

বিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত, অধিকার বঞ্চিত, শোষিত মানুষের মুক্তি দূত, মানবতার মহাত্মা, বিশ্বের সংস্কার আন্দোলনের অগ্রনেতা, অমানিশায় অন্ধকারচ্ছন্ন ভুবনকে আলোর পথে সন্ধান দানকারী, মজলুমের ভ্রাতা, ক্ষমা ও মহানুভবতার ধারক ও বাহক এবং স্বৈরাচারের আতংক রূপে যিনি আরব মরুদ্যানে আল্লাহর রাহমতের অশেষ বর্ষন রূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন মুহাম্মদ (স)। তিনি নিজেই ছিলেন তাঁর নিজ শিক্ষার বাস্তব নমুনা। চারত্রিক সৌন্দর্যের পূর্ণতার চরম শিখরে পৌছেছিলেন তিনি। সততা-সত্যবাদিতা, ন্যায়-পরায়নতা, বীরত্ব, সাবলম্বন, সৎসাহস, নির্ভীকতা, উদারতা, মহত্ত্ব, সংযম, বিশ্বস্ততা, শিষ্টাচার, বিনয়-নম্রতা, দানশীলতা, ধৈর্য, ক্ষমা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, সেবা, সাহায্য, সহানুভূতি, ভক্তি, প্রেম, বদান্যতা ও ন্যায়-অন্যায় বুঝার ক্ষমতা ইত্যাদি গুনের এমন কোনো দিক নেই যা বিশ্ব নবীর পূর্ণাঙ্গতার সাক্ষ্য বহন করে না।

শত্রুকে ভালোবাসার উপদেশ ও অত্যাচারীকে ক্ষমা করার নির্দেশ ও বহু মহা পুরুষের নিকট থেকে পাওয়া যায় কিন্তু সংঘাতময় মানব ইতিহাসে বাস্তব ক্ষেত্রে জাতীয় উপকরণ সত্যিই বিরল। ক্ষমা ও ভালোবাসা নিঃসন্দেহে চির সুন্দর। এটির সুন্দর পূর্ণ সৌরভে ভরে উঠে তখনই যখন অসহায় ও দুর্বলকে ভালোবাসে, সবল-প্রবল প্রভাব প্রতিপত্তিশালী মানুষ যখন দ্বিধাহীন চিত্তে ক্ষমা করে তার দূর্বল শত্রুকে।

সেই ক্ষমাই প্রকৃত ক্ষমা, সেই ক্ষমাই সত্যিকার স্বীকৃতি পায় যে ক্ষমার পিছনে নেই কোনো দুর্বলতা, নেই কোনো অসহায়তা, নেই কোনো অভিমান, যে ক্ষমা উৎসারিত হয় সবলের হৃদয় থেকে দূর্বল হয়ে পড়া অপরাধী বা অত্যাচারীর জন্য। ইরানী কবির ভাষায় বলতে হয়। "উন্নত শির ব্যক্তির বিনয়ই শোভা পায়। ভিক্ষুকের বিনয় তা তার স্বভাব মাত্র"। প্রিয় নবী মুহাম্মদ (স) এর ক্ষমা ছিল সত্যিই অসাধারন ও নজীরবিহীন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এরশাদ করেছেন-

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم

অর্থাৎ, তোমাদের নিকটে স্বয়ং তোমাদের মধ্য থেকেই এমন এক রাসূল এসেছেন, যার কাছে সে প্রতিটি জিনিস কষ্ট দায়ক হয় যা তোমাদের ক্ষতিকারক, যে তোমাদের কল্যানকামী এবং আহলে ঈমানদের জন্যে বড়ই স্নেহশীল ও দয়ালু। (তওবা : ১২৮)

মুলত : মহানবী (স) এর ক্ষমা ছিল প্রকৃত বীরের ক্ষমা, সেখানে ছিলনা কোনো স্বার্থ। মানুষকে ক্ষমা করাই ছিল তার ধর্ম তাই আত্মীয়-অনাত্মীয়, শত্রু, মিত্র, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত, মূর্খ, পুরুষ-নারী, সকলের অপরাধই তিনি ক্ষমা করেছেন দ্বিধাহীন চিত্তে। যে বর্বর আরব জাতি সুদীর্ঘ তের বছর ধরে তার নিজের উপর, অকথ্য ও অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে, অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে যারা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তাকে নিদারুন যন্ত্রনার শিকারে পরিণত করেছে। যারা অবিরত তাঁকে গঞ্জনা ও লাঞ্চনা দিয়েছে পথে-ঘাটে, পর্বত-প্রান্তরে যারা নির্লজ্জভাবে তার প্রতি বিদ্রুপের বাণ নিক্ষেপ করেছে। তাঁকে ও তাঁর মহান বানীকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ করার জন্য যাদের ছিল অক্লান্ত ও বিরামহীন প্রয়াস, বিজয়ী মুহাম্মদ (স) এর কাছ থেকে তারাই পেয়েছিল শর্তহীন ক্ষমা।

এ প্রসঙ্গে মহানবী (স) বলেছেন "যে, ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।" (বুখারী ও মুসলিম)

* সহযোগী অধ্যাপক, সাইন্সেস অব হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

ক্ষমা মহত্তের লক্ষণ, ক্ষমা ছিল হযরতের চরিত্রের ভূষন। ক্ষমা একাধারে ধৈর্য ও দয়ার পরিচায়ক। কোনো দিন কারও উপর তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। আবু সুফিয়ান ও তার স্ত্রী হিন্দা, সাফওয়ান, আব্দুল্লাহ বিন উবাই প্রমুখ শত্রুগন হযরতকে কতভাবে নির্যাতন করেছিলেন। কিন্তু তাদেরকেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এই রূপ অসংখ্য ক্ষমা ও মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত মহাপুরুষের জীবনকে মহিমা মন্ডিত করে রেখেছে।

এক কথায় বলতে গেলে আল্লাহর হাবীব ছিলেন নম্রতা, কোমলতা ও মহানুভবতায় ভরপুর। ধীর-স্থির শান্তভাবে কথা বলা ছিল তার অভ্যাস প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স) অন্যান্য নবী রাসূলগণের মতো কোনো এক নির্দিষ্ট কওম, অঞ্চল কিংবা কোনো নির্দিষ্ট জনপদের মানুষের হেদায়াত দান করার জন্য পৃথিবীতে তাশরীফ আনায়ন করেন নি। তিনি পৃথিবীতে তাশরীফ এনেছেন সমগ্র মানব জাতির জন্য, সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য পবিত্র কুরআনে তাঁকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেছেন

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

অর্থাৎ , হে মুহাম্মদ (স) আপনাকে সমগ্র বিশ্বে জন্য শুধু মাত্র রহমত স্বরূপ প্রেরণ করে পাঠিয়েছি। (সূরা আম্বিয়া:১০৭)
মানুষকে শাস্তি দেয়ার জন্য, অভিশাপ দেয়ার জন্য তিনি আসেন নি। এসেছিলেন বিপথগামী মানুষকে সৎ পথে প্রেম ভালোবাসা ক্ষমা ও মাহনুভবতার আলোকে মহান আল্লাহর নির্দেশিত পথে পরিচালনা করার জন্য। তাই তাকে অত্যাচারীদের ধ্বংস কামনা করার অনুরোধ জানানো হলে তাঁর স্বভাব সুলভ মহানুভবতার সাথেই তিনি উত্তর দেন "আমি মানব জাতির জন্য আল্লাহর রাহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছি। অভিসম্পাত করতে আসিনি। তাঁর অভিমতে দ্বীন হলো সকলের জন্য মংগল কামনার রাহমত নাম। (বুখারী)
ক্ষমা ও মহানুভতার ধারক ও বাহক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) মক্কা বিজয়ের পর তিনি সুরাকাকে বিনা শর্তে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করেন। এমনকি হিজরতের সময়ে সুরাকার ঘৃনিত প্রয়াসের বিন্দুমাত্র কোনো উল্লেখও করেন নি। এভাবে বদর, ওহুদ ও খন্দক প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুদ্ধসমূহে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযানগুলি যে নিষ্টুর ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় হয়েছিল তার নাম আবু সুফিয়ান। তাকেও মহানবী (স) নির্ভয় ও উদারতার পরিচয় দিয়ে ক্ষমা করে দিয়েছেন।
পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষনা দিয়েছেন-

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم

অর্থাৎ ভালো মন্দ এক নয়, মন্দের পরিবর্তে ভালো ব্যবহার কর, দেখবে তোমার পরম শত্রু, যার ও তোমার মধ্যে ঘোর বিদ্বেষ রয়েছে, তোমার বন্ধুতে পরিণত হবে। (সূরা হা মিম : ৩৪)।
আমাদের প্রিয় নবী (স) অক্ষরে অক্ষরে সঠিকভাবে পালন করেছিলেন আল্লাহর এই মহান নির্দেশ, আর তাইতো করুনাময়ের অসীম মহিমায় তিনিই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট মহাপুরুষ। জীবনে কত অপরাধীকে কতভাবে কত বার যে তিনি ক্ষমা করেছেন তার কোনো ইয়াত্তা নেই। ক্ষমা করার জন্যেই যেন তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল, ক্ষমাই যেন ছিল তাঁর ধর্ম।
আবু জেহেলের পৈশাচিক নৃশংসতা সবৃজনবিদিত। আবু জেহেলের পুত্র ইকরামাহ ও ছিল পিতার মতই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী। পিতার সাথে মিলিত হয়ে বছরের পর বছর অসহায় মুসলমানদের উপরে যে, অকথ্য ও নৃশংসা অত্যাচার সে চালিয়েছে, তা সত্যিই ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। স্বভাবতই মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের পর প্রাণ বাঁচানোর জন্য ইকরামাহ পালিয়ে যায়। কিন্তু তার স্ত্রী মহানবী (স) এর মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। স্বামীকে ফিরিয়ে এনে হযরত (স) এর দরবারে উপস্থিত করে। অসামান্য ও অতুলনীয় ঔদার্য্য ও মহানুভবতার অধিকারী প্রিয় নবী (স) ইকরামাকে শুধু ক্ষমাই করেন নি তাঁর সম্মুখে ইকরামাকে হাজির করা হলে তিনি তাঁকে মারহাবান বিকুম বলে স্বাগত সম্ভাষন জানান।
নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা ও পাশবিক উম্মাদনার যে কোনো আলোচনায় আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার কথা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। হিন্দার নৃশংসতা ও বৈশাচিক বিদ্বেষ ইতিহাসে সত্যিই নজীরবিহীন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে শায়িত হযরত হামজা (রা) এর লাশ থেকে ছিঁড়ে নেয়া কলিজা প্রকাশ্যে চিবিয়ে খাবার যে নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত হিন্দা রেখেছিল, পৃথিবীর নিষ্টুরতার ইতিহাসে তার নজীরবিহীন প্রতিহিংসা অমানুষিকতা ও উম্মাদনার ইতিহাসে তা সত্যিই কোনো তুলনা নেই। কিন্তু সেই পিশাচিনীকেও হযরত মুহাম্মদ (স) এর কাছে হাজির করা হলে তিনি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করার বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত রাখেন। মহানবী (স) এর অসাধারন ও অত্যাশ্চার্য ঔদার্য্য ও মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে হিন্দার মত রমনীও সেদিন উচ্চসিত কণ্ঠে ঘোষণা করে। মুহাম্মদ পৃথিবীতে তোমার তাঁবু অপেক্ষা অন্য কোনো তাবুকে আমি অধিক ঘৃনা করিনি। কিন্তু আজ তোমার তাঁবুই

আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। সত্যিই অতুলনীয়, অসাধারণ, অবিশ্বাস্য ও অদ্ভুত পূর্ব ছিল মহানবী (স) এর হৃদয়ের বিশালতা, ঔদার্য্য, মহানুভবতা ও দয়া।

এমনি অসামান্য গুনাবলী ও অনুপম ঐশ্বর্যের আঁধার ছিলেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স)। তাঁর সৎ কল্যাণময় এবং করুণা সিক্ত মহান আদর্শের তুলনা বিরল। পতিত মানবতা প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে সেই আদর্শের সুশীতল ছায়ায় পরম নিশ্চিন্তে আশ্রয় লাভ করে ধন্য হয়েছে। আমাদের শপথ নিতে হবে। আমরা মহান রাসূলের (স) পূত পবিত্র চরিত্র মাধুর্যে মাধুর্যময় হবো। শুধু কথায় নয় কাজে-কর্মে আমলে আখলাকে আমরা সর্বদাই তাঁর অনুসরণ করব। তাহলে আমাদের জীবন হবে সত্যিকারের সাফল্যে ভরপুর এবং তখনই ফলপ্রসু, সার্থক ও মহীয়ান হবে। আল্লাহ আমাদেরকে রাসূল (স) এর ক্ষমা, মহানুভবতা এবং আদর্শ পূর্ণভাবে অনুসরনের তাওফীক দিন। আমিন।

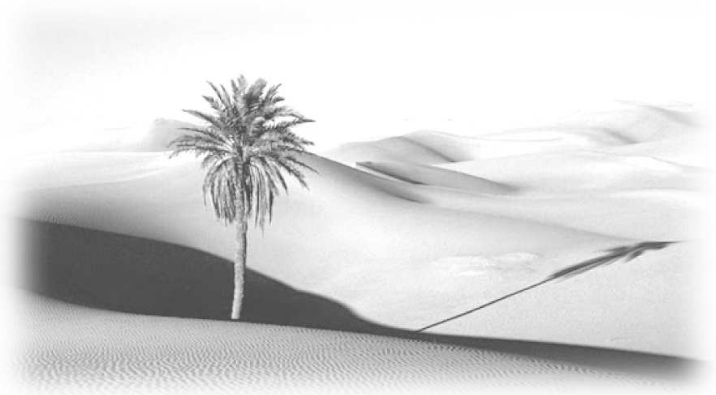

মোঃ নেজাম উদ্দীন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মোবাইল : ০১৮১৯-৩৩৬০৫৮
০১৯৭৯-৩৩৬০৫৮
ফোন : ০৩১-২৮৬৯২৫৮

সময়ের সাথে সৃজনশীল জ্ঞানের পথে

প্রাইম বুক ডিপো

অনার্স, মাস্টার্স, বিশ্ববিদ্যালয়ের বইয়ের জগতে একটি গ্রহনযোগ্য নাম

প্রধান শাখা : ১২, শাহী জামে মসজিদ, শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

দ্বিতীয় শাখা : ১/৯, পোস্ট অফিসের সামনে শাহী জামে মসজিদ, শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

হাদিস অধ্যয়নে অগ্রাধিকার নির্ণয়ে পরামর্শ

শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল *

ইসালামের দু'টি মৌলিক উৎসের অন্যতম উৎস হচ্ছে হাদিস। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা, কাজ ও সমর্থনকে সাধারণভাবে হাদিস বলে। এ কথা সত্য যে, কুরআন আল্লাহর সরাসরি কথা, এটি তিলাওয়াত করলে ছাওয়াব হয় কিন্তু আমরা অনেকেই কুরআনকে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে তুলনামূলকভাবে হাদিসকে কম গুরুত্ব দিয়ে ফেলি। হাদিস দ্বারাও আকীদা, ইবাদাত, মু'আমালাত-এর ক্ষেত্রে বিধান সাব্যস্ত হয়। আবার কুরআন বোঝার জন্যও হাদিস পাশে রাখা জরুরি।

ইদানিং বাংলা ভাষী পাঠকদের মাঝে হাদিস অধ্যয়নে বেশ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তারা হাদিসের গ্রন্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণে হিমশিম খেয়ে যান। কেউ কেউ অতি আবেগের বশে প্রথমেই বড় বড় হাদিসের কিতাব পড়া শুরু করেন। এমতাবস্থায় তাদের আগ্রহকে স্বাগত জানিয়ে তাদের জন্য এবং যারা হাদিস অধ্যয়ন করার পরিকল্পনা করছেন বা করবেন তাদের সুবিধার জন্য কিছু পরামর্শ দিচ্ছি। এই পরামর্শ হুবহু অনুসরণ করার মধ্যে বিশেষ কোনো ফযীলত নেই। তবে আরব আলিম-উলামাদের পরামর্শ ও আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি তালিকা এখানে দেয়া হলো, যা অনুসরণ করলে হাদিস পাঠকগণ উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়, ইনশা-আল্লাহ।

০১. প্রথমেই বড় কিতাব যেমন সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম বা মিশকাত বা সুনানের অন্যান্য কিতাব (সুনান আবু দাউদ, নাসাঈ ইত্যাদি) দিয়ে শুরু করবেন না।

০২. প্রথমে শুরু করবেন ছোট কিতাব দিয়ে। যেমন, ইমাম নববী (রহ) এর লেখা চল্লিশ হাদিস (হাদিসে আরবাঈন)। অনেকেই এর বাংলা অনুবাদ করেছেন। এর বাংলা অনুবাদ এবং ইংলিশ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বাজারে ও ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। এটির আরবীতে অনেকগুলো ব্যাখ্যা রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো লিখেছেন শাইখ মুহাম্মদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (র)।

০৩. চল্লিশ হাদিস পড়া হলে যদি হুকুম-আহকাম বিষয়ে আগ্রহ বেশি থাকে তাহলে হাফিয ইবনু হাজার আসকলানী (র) সংকলিত "বুলুগুল মারাম" পড়া শুরু করতে পারেন। এটিরও আরবী, বাংলা, ইংলিশ ভার্সন বাজারে ও ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। আরবীতে ব্যাখ্যাও রচিত হয়েছে একাধিক। একাধিক ব্যাখ্যা গ্রন্থ বাংলায়ও প্রকাশিত হয়েছে।

০৪. আর যদি চল্লিশ হাদিস পড়ার পর হুকুম-আহকাম-এর দিকে না গিয়ে আদব-আখলাক-এর দিকে আগ্রহ বোধ করেন তাহলে ইমাম নববী (র) -এর "রিয়াদুস সালিহীন" পড়া শুরু করতে পারেন। এটিরও আরবী, বাংলা, ইংলিশ ভার্সন বাজারে পাওয়া যায়। ব্যাখ্যাও রচিত হয়েছে একাধিক। একাধিক ব্যাখ্যা গ্রন্থ বাংলা ভাষাতে প্রকাশিত হয়েছে।

০৫. চল্লিশ হাদিসের পরে বুলুগুল মারাম ও রিয়াদুস সালিহীন; দুটিই পড়তে হবে। কোনটি আগে পড়বেন সেটি আপনার ইচ্ছা। একই সাথে দুটি ভিন্ন স্বাদ পাওয়ার জন্য চাইলে দুটি কিতাব একই সাথেও পড়তে পারেন।

০৬. এই তিনটি কিতাব (চল্লিশ হাদিস, বুলুগুল মারাম ও রিয়াদুস সালিহীন) পড়ার পর যে হাদিসগুলো বুখারী ও মুসলিমে কমন হাদীস অর্থাৎ মুত্তাফাকুন আলাইহ হাদিসগুলো পড়ে ফেলতে পারেন। গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে এই হাদিসগুলো সর্বোচ্চ মানের। শাইখ ফুয়াদ আব্দুল বাকী-এর লেখা "আল-লু'লু' ওয়াল মারজান ফীমাত্তাফাকা আলাইহিস শাইখান" এই বিষয়ক প্রসিদ্ধ কিতাব। এটি একাধিক প্রকাশনী বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছে। এতে ২ হাজারের বেশি হাদিস রয়েছে।

০৭. এই চারটি পড়ার পর ইমাম বুখারী (র) এর লেখা "আল-আদাবুল মুফরাদ" পড়তে পারেন। এটিও বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারসহ অনেকেই বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছে। এটিরও তাহকীক করা অনুবাদ পড়া উচিত।

* সাবেক প্রধান সম্পাদক, সমকালীন প্রকাশন, ঢাকা

০৮. এই পাঁচটি কিতাব পড়ার পর মিশকাতুল মাসাবীহ-পড়া শুরু করতে পারেন। এটি বেশ বড় কিতাব। এই কিতাবটি আলিয়া ও কওমী মাদরাসাগুলোতে সিলেবাসভুক্ত। এটি আমাদের দেশে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হাদিসের কিতাব। কিন্তু এই কিতাবের সব হাদিস সহীহ নয়। এই কিতাবে কিছু জাল ও যঈফ হাদিসও আছে। তাই এটি পড়ার সময় তাহকীক করা অনুবাদ পড়তে হবে। একান্ত না পাওয়া গেলে সাধারণ অনুবাদও পড়া যেতে পারে। হাদিস একাডেমী তাহকীক ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ করেছে বলে জানি। এমদাদিয়া লাইব্রেরিও তাহকীক ছাড়া বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছে। তাহকীক মানে হচ্ছে হাদিসটি সহীহ, হাসান, যঈফ নাকি জাল ইত্যাদি মান উল্লেখ করা। "মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদিস সমূহ" নামে একটি বই বাজারে পাওয়া যায়। বইটিতে শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. এর তাহকীকসহ হাদিসগুলো সংকলন করেছেন ড. মুযাফফর বিন মুহসিন। এই বইটিও সাথে রাখতে পারেন।

০৯. এর পরে সহীহ বুখারী তারপর সহীহ মুসলিম তারপর সুনান আবু দাউদ, জামি তিরমিযী, সুনান নাসাঈ, সুনান ইবনু মাজাহ ইত্যাদি ধারবাহিকভাবে পড়তে পারেন। এখানে যেভাবে সিরিয়াল উল্লেখ করা হয়েছে সেই সিরিয়াল অনুসরণ করলে ভালো হবে।

১০. এগুলো পড়া হয়ে গেলে যারা আরো গভীরভাবে হাদিস অধ্যয়ন করতে চান তারা ইমাম মালিক (র)-এর লেখা মুয়াত্তা, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (র)-এর মুসনাদে আহমদ, ইমাম বাইহাকী রহ.-এর শু'আবুল ঈমান, সুনানে বাইহাকী, ইমাম দারিমী (র)-এর সুনানুদ দারিমী, ইমাম ইবনু খুযাইমাহ (র)-এর সহীহ ইবনু খুজাইমাহ, ইমাম ইবনু হিব্বান (র)-এর সহীহ ইবনু হিব্বান, শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (র) এর জাল ও যঈফ হাদিস সিরিজ (সিলসিলাতুল আহাদীস আয-যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ...) অধ্যয়ন করতে পারেন। এগুলোর মধ্যে কিছু বাংলায় অনুবাদ হয়েছে কিছু বাকী আছে।

১১. বুখারী ও মুসলিম ছাড়া বাকীগুলো অবশ্যই তাহকীক (সহীহ-যঈফ-জাল নির্ণিত) অনুবাদ পড়তে হবে।

১২. হাদিসের বইগুলোর বাংলা অনুবাদ অনেক প্রকাশনীই প্রকাশ করেছে। যারা এগুলো সংগ্রহ করতে চান তারা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তাওহীদ পাবলিকেশন, দারুস সালাম রিয়াদ, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, হাদীস একাডেমী, হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, সুনান প্রকাশনী, ওয়াহিদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরি ইত্যাদিসহ গ্রহণযোগ্য ও ভালো মানের প্রকাশনী গুলো থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। আরবী হাদিসের বই বাংলাদেশে কেনার জন্য মাকতাবাতুল আযহার-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

১৩. যারা আরবী জানেন তারা আরবীতে লেখা শারহ (ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলো) পাশে রেখে হাদিস পড়ুন। শারহ গুলো হার্ডকপি কিনতে পাওয়া যায়। আবার ইন্টারনেটেও পাওয়া যায়।

১৪. আর সুযোগ থাকলে অবশ্যই কোনো একজন যোগ্য উস্তাযের কাছে হাদিস পড়ুন, উসূলে হাদিস বুঝে হাদীস পড়ার চেষ্টা করুন। আর সব সময় আল্লাহর কাছে হাদিস বোঝার তাওফীক কামনা করুন।

১৫. কয়েকটি হাদিস পড়েই ফাতাওয়া দেয়া শুরু করা ঠিক নয়। তবে সাধারণ স্পষ্ট অর্থবোধক (ব্যাখ্যা ছাড়া বোঝা যায় এমন) হাদিসগুলো মানুষের মাঝে প্রচার করতে পারেন।

১৬. তবে একটি কথা সবার শেষে বললেও সবার আগেই মনে রাখবেন, তা হলো, যে কোনো হাদিস বুঝতে সমস্যা হলে যোগ্য আলিমের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে বুঝে নিবেন। নিজের বুঝকে অগ্রাধিকার না দিয়ে সালাফে সালিহীনের বুঝকে অগ্রাধিকার দিবেন এবং আমলযোগ্য হাদিস অনুযায়ী আমল করার নিয়্যাত নিয়ে হাদিস পড়ুন এবং আমল করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ তাওফীকদাতা।

নোট : শাহাদত হুসাইন খান ফয়সাল ফুসফুসে জটিলতার কারণে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্তেকালের প্রায় ১ মাস আগে হাদিস স্টাডিস এ প্রকাশের জন্য এই লেখাটি পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। আমীন
-সম্পাদক।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (স) এর ভূমিকা

মো: তোফাজ্জল বিন আমীন

আমরা বড্ড কঠিন সময়ের মধ্যে বসবাস করছি। কোথাও যেন এতটুকু স্বস্তির জায়গা নেই, যেখানে দাঁড়িয়ে বলা যায় আমরা ভালো আছি। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে অন্যায়ের সাথে ন্যায়ের দ্বন্দ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেখানে সত্যের আলো প্রসারিত হয়েছে, সেখানেই অন্ধকারের অমাবস্যা বাধার প্রাচীর তৈরি করেছে। আমরা সবাই ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা করি। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায়বিচারের অভাব প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করা যায়। কারণ মানব রচিত আইন দিয়ে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করা য়ায় কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

সারা বিশ্বের আইন ব্যবস্থার চিত্রটা দেখলে মনে হবে পৃথিবীটা একটা কারাগারে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি দেশের বিচার বিভাগ আইনের সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের পক্ষে, ন্যায়বিচারের কথা বলে। আইনের সুশাসনের কথা বলে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আইনের সুশাসন কোথাও নেই। কোনো রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হচ্ছে সে সমাজে সুবিচার নিশ্চিত করা। একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থার যতগুলো দিক ও বিভাগ প্রয়োজন, সেসব দিক ও বিভাগই ইসলাম নির্দারণ করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন সে সমস্ত বিভাগরে একজন দক্ষ মহামানব। পৃথিবীবাসীর জন্য তিনি হলেন একমাত্র অনুকারণযোগ্য মডেল। তিনি শুধুমাত্র আরবের নেতা নন, সমগ্র বিশ্বের ও সমগ্র সৃষ্টির। আর এ কারণেই তাঁর আগমনবার্তা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়। একজন পূর্ণাঙ্গ মহামানব হিসাবে তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই রেখে গেছেন অনুপম আদর্শ। একজন শিশু, এতিম, ধর্ম প্রচারক, রাষ্ট্র নায়ক, একজন ন্যায়বিচারক হিসেবে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

মদীনা সনদের আলোকে, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (স) মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপরিতর দায়িত্ব পালন করেন। মসজিদে নববীতে বসে তিনি রাষ্ট্রীয় অন্যান্য কাজের পাশাপাশি বিচারকার্যও পরিচালনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালার বিধান অনুযায়ী তিনি বিচার ফয়সালা করেছেন। পক্ষপাতিত্ব কিংবা আবেগতাড়িত হয়ে কোনো বিচারকার্য পরিচালনা করছেন, এমন ঘটনা তাঁর বিচারপতি জীবনের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি বিচার পরিচালনা করতে গিয়ে কোনো দিন নিজের আত্মীয়-স্বজন কিংবা সাহাবীদের পক্ষ অবলম্বন করেননি। দুনিয়ার প্রচলিত বিচারব্যবস্থায় অনেক সময় নির্দোষ মানুষের ফাঁসি হওয়ার ঘটনা শোনা যায়। কিন্তু তাঁর জীবনে এসবের কোন নজীর নেই। একজন সফল রাষ্ট্রনায়কের পাশাপাশি শ্রেষ্ঠ বিচারপতি হিসেবে তিনি যে বিচার-ফয়সালা করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণীয় হয়ে থাকবে। জীবদ্দশায় তিনি যে সমস্ত বিচার ফয়সালা করছেন, তা সবটুকু লেখা সম্ভব নয়। কারণ লিখতে গেলে পুরো একটি বই লেখা হয়ে যাবে। তারপরেও ইতিহাসের পাতা থেকে ন্যায়বিচারের কিছু নমুনা এ প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে পেশ করছি।

১। হযরত মুহাম্মদ (স) দুনিয়াতে এসেছিলেন মানবতার মুক্তির দূত হিসেবে। তাঁর আগমনে অন্ধকার অমানিশার ঘোর অন্ধকার পেরিয়ে আলোর রশ্মি প্রস্ফুটিত হয়েছে। তিনি ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে আরব দেশের মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন এবং আরব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। রাসূল (স) পৃথিবীর কোনো মানুষের মনোনীত বিচারক ছিলেন না, বরং তিনি স্বয়ং দুনিয়া ও আরশের মালিক মহান আল্লাহর মনোনীত বিচারক ছিলেন। আল কুরআনে ঘোষণা করা করা হয়েছে, ‘হে নবী আমি সত্যসহকারে আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি, যাতে আপনি আল্লাহর দেখানো যুক্তির আলোকে বিচার ফয়সালা করতে পারেন।” (সূরা নিসা : ২০৫) “হে নবী বলুন, আমি আল্লাহর নাজিলকৃত কিতাবের উপর ঈমান এনেছি এবং তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।’ (সূরা শুরা : ১৫) এ থেকে প্রমাণিত যে রাসূল (স) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নিয়োজিত বিচারক ছিলেন। বিচারক সব মানুষের সাথে সমান ব্যবহার করবেন এটাই তো স্বাভাবিক! কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য বিচারকরা ন্যায়বিচার করতে পারছেন না।

* বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক।

২। দুনিয়ার আদালতে যারা বিচারকের দায়িত্ব পালন করছেন তাদের জন্য এই হাদিস খুবই প্রণিধানযোগ্য; হযরত বুরাইদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বিচারক তিন প্রকার- এক প্রকার জান্নাতি আর দু'প্রকার জাহান্নামি। জান্নাতি তিনি, যিনি সত্য অবগত হয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। আর যে ব্যক্তি জেনেশুনে অন্যায় ফয়সালা দান করেন আর যে সত্য না জেনে আন্দাজ বা অনুমানের ভিত্তিতে বিচারকার্য পরিচালনা করেন, তারা উভয়ই জাহান্নামি।" ইনসাফভিত্তিক বিচার-ফয়সালা করার জন্য রাসূল (স) এর অনুসরণ করা প্রয়োজন। কারণ তিনি কোনো দল বা গোষ্ঠীর প্ররোচনায় বিচার-ফয়সালা করেননি। তিনি ছিলেন আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি ও বেইনসাফীর উর্ধ্বে। পৃথিবীর কোনো দার্শনিক ইতিহাসবেত্তা বা লেখক রাসূল (স) এর বিচারনীতি নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত শতচেষ্টা করেও কোনো বিচ্যুতি খুঁজে পাবেন না। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, "একবার মাখযুম গোত্রের এক কুরাইশী মহিলা চুরি করে ধরা পড়ে।' রাসূলুল্লাহ (স) তার হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। নির্দেশ শুনে লোকজন খুব পেরেশান হয়ে পড়লো। কারণ সেই মহিলা ছিল সম্ভ্রান্ত বংশের। তারা বলাবলি করতে লাগল, উসামা ইবন যায়িদ ছাড়া আর কে আছে, যাকে আল্লাহর রাসূল (স) অধিক ভালোবাসেন। তারা উসামা (রা) কে সুপারিশের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে পাঠালেন। যখন তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথে কথা বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, "হে উসামা! তুমি কি আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা না করার সুপারিশ করতে এসেছো?' তখন উসামা ইবন যায়িদ ভয় পেয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার ভুল হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন। প্রথমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হামদ ও সানা পেশের পর বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকজন এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিতো এবং দুর্বল লোক চুরি করলে তাকে শাস্তি দিতো। ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আজ যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করতো তবে আমি তার ক্ষেত্রেও হাত কাটার নির্দেশ দিতাম।

৩। রাসূল (স) এর বিচারকার্যের মূল ভিত্তি ও উপকরণ ছিল মহাগ্রন্থ আল কুরআন। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত- 'রাসূল (স) যখন তাকে ইয়েমেনে পাঠালেন, তখন বললেন, কীভাবে তুমি বিচার কার্য পরিচালনা করবে? মু'আয (রা) বললেন, 'আল কুরআনের ফয়সালা অনুসারে।' রাসূল (স) বললেন, যদি ঐ বিষয়ে আল কুরআনে কোনো ফয়সালা খুঁজে না পাও? মু'আয (রা) বললেন, সুন্নাহ দ্বারা। রাসূল (স) বললেন, যদি তাতেও না পাও? তিনি বললেন, 'আমার ইজতিহাদ দ্বারা এবং এতে কোনো প্রাকার সংকীর্ণতা দেখাবো না।' এরপর নবী করিম (স) হযরত মু'আযের বুকে হাত রেখে বললেন, 'প্রশংসা সেই আল্লাহ তায়ালার যিনি তাঁর রাসূলের দূতকে এমন ক্ষমতা দান করলেন, যাতে আল্লাহর রাসূল (স) সন্তুষ্ট।" (তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী)।

নবী করিম (স) এর বিচারকার্যের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল বিচার করার সময় তিনি বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের কথাবার্তা শুনে পক্ষে-বিপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করে রায় দিতেন। ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে বিচারকার্য পরিচালনা না করা সম্পর্কে নবী করিম (স) কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন।"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আউফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা একজন বিচারকের সাথে ততক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ সে বিচারকার্যে জুলুম অত্যাচারের উর্ধ্বে থাকে, যখন জুলুম ও বেইনসাফী করে, তখনই আল্লাহ তার থেকে পৃথক হয়ে যান এবং শয়তান এসে তার সাথী হয়ে যায়।" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)। "হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ন্যায়বিচারক কিয়ামতের দিন এই আকাঙ্ক্ষা করবে যে, দু'ব্যক্তির মধ্যে সামান্য খেঁজুরের ফয়সালাও যদি তাকে পৃথিবীতে না করতে হতো, তবে কতই না ভালো হতো।" (মুসনাদে আহমদ)।

৪। রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে নববীতে বসে রাষ্ট্রীয় অন্যান্য কাজের পাশাপাশি বিচারকার্যও পরিচালনা করতেন। শুধু কি তাই? দেশের জনগণের মধ্যে একবিন্দু বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন না করার জন্য দায়িত্বে থাকা কর্মচারীদের প্রতি তিনি কঠোর নির্দেশ দিয়ে রাখতেন। তিনি নিজে কোনো তোষামোদ বা প্রশংসা পছন্দ করতেন না। জনগণকে সমালোচনার অবাধ অধিকার দানে একজন সাধারণ নাগরিকও রাষ্ট্রীয় প্রধানের সমালোচনা করতে বিন্দুমাত্র পরোয়া করতো না। আমাদের পারিপার্শ্বিক দিকে একটু নজর দিলে দেখা যাবে যে, তেলমর্দন ব্যতীত কোনো প্রমোশন বা ফাইল নড়ে না। বিচার ব্যবস্থার কথা না হয় বাদই দিলাম। 'বিচারের নামে কেউ অবিচার বা শাসনের নামে কেউ দুঃশাসন করেছেন প্রমাণিত হলে তিনি কঠোরভাবে তার বিচার করতেন।

৫। আবু দাউদে আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে ইয়েমেনের বিচারক নিযুক্ত করে পাঠানোর প্রাক্কালে আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে পাঠাচ্ছেন অথচ আমার বয়স কম। বিচার-ফয়সালা সম্পর্কে আমার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা বা যোগ্যতা নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, 'আল্লাহ অচিরেই তোমার অন্তরে হেদায়াতের নূর সৃষ্টি করে দেবেন এবং তোমার জবান সুদৃঢ় রাখবেন। যখন বাদী বিবাদী তোমার সামনে এসে উপস্থিত হবে, তখন একজনের বক্তব্য শুনেই রায় দেবে না, বরং দু'জনের বক্তব্য শুনবে। এতে ফয়সালার দিগন্ত তোমার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।' আলী (রা) বলেন, 'এরপর থেকে আমি কখনো বিচার নিষ্পত্তির ব্যাপারে দ্বিধা-সংশয়ে পতিত হইনি।' বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, আইন কাঠামোর অস্বচ্ছতা, আইনের সীমাবদ্ধতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, বিচার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা, রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে ক্ষমতাসীনদের জন্য বিচারের রায় হয় স্বস্তির, অন্যদিকে ক্ষমতার বাইরে থাকা দলগুলোর জন্য হয় অস্বস্তির। যার ফলে বিশ্বব্যাপী আজ ইনফাস ও ন্যায়বিচার ভূলুণ্ঠিত। এমনও দেখা গেছে যে হত্যার আসামি খালাস পেয়ে যায় সহজে; আবার নিরপরাধ মানুষ বছরের পর বছর কারান্তরীণ হয়ে থাকে কত নিরপরাধ নিরীহ মানুষ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়ে চার দেয়ালের ভেতর আটকা থাকছে সে হিসেব ক'জনে রাখে? ইতিহাস সাক্ষী রাসূল (স) সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার সংরক্ষণে এক আপসহীন যোদ্ধা ছিলেন। ন্যায়বিচারের তিনি যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে- একদিন এক ইহুদি রাসূল (স) এর কাছে একজন সাহাবীর বিরুদ্ধে নালিশ করলেন এবং বিচারপ্রার্থনা করলেন। রাসূল (স) সাহাবীর পক্ষে রায় না দিয়ে ইহুদির পক্ষে রায় দিলেন।

আজকে যারা সাম্প্রদায়িকতার জুজুর ভয় দেখিয়ে মুসলমানদের ওপর একতরফা ভাবে সব দোষ চাপিয়ে দেন তারা যদি বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর বিচার ফয়সালা অনুসরণ করতেন তাহলে বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদতো না। একথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, দুনিয়ার বিচারপতির ওপর আরেকজন বিচারপতি আছেন। সেই বিচারপতির সামনে একদিন সকল বিচারপতিকে দাঁড়াতে হবে। এই অশান্ত পৃথিবীর ন্যায়বিচারের দায়িত্বে যারাই নিয়োজিত রয়েছেন তারা যদি মুহাম্মদ (স) এর ন্যায়বিচার থেকে শিক্ষা নিতে পারতেন, তাহলে বিচারালয়ে কোনো মানুষ অবিচারের শিকার হতো না।

গৃহকর্মীদের সাথে মহানবী (স) এর আচরণ

নাজমুল হুদা সোহেল

গৃহকর্ম পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো পেশাসমুহের একটি। বর্তমান বিশ্বে প্রায় ৫২.৬ থেকে ১০০ মিলিয়ন মানুষ গৃহ শ্রমে নিয়োজিত রয়েছে।[১] 'গৃহকর্মী' বলতে এমন কোন ব্যক্তিকে বোঝায় যে নিয়োগকারীর গৃহে মৌখিক বা লিখিতভাবে খণ্ডকালীন অথবা পূর্ণকালীন নিয়োগের ভিত্তিতে গৃহকর্ম সম্পাদন করে। গৃহকর্মীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৃহকর্তা কর্তৃক নানাবিধ নির্যাতনের শিকার হয়। গৃহকর্মী নির্যাতন অতি পুরনো সামাজিক ইস্যু হলেও আধুনিক ভোগবাদী সমাজে এটি ভয়াবহ রোগে পরিণত হয়েছে। শুধু দৈহিক নির্যাতনই নয়, ইদানীং অহরহই ঘটছে ধর্ষণ ও হত্যার মতো ঘটনা। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস্) এর এক সমীক্ষা অনুযায়ী গত ২০০১ ইং থেকে ২০১৩ ইং সাল পর্যন্ত কাগজে-কলমে গৃহ শ্রমিকদের উপর অমানবিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৯৪৬ টি। এর মধ্যে নিহত হয়েছে ৫২৭ জন, পঙ্গুত্ব বরণ করেছে ৩৯৮ জন, অন্যান্য নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১২১ জন।[২] এটা হলো কাগজে-কলমের হিসাব। বাস্তবে এই সংখ্যা বহুগুণ বেশি। মুসলিম সমাজে এসব অমানবিক নির্যাতন সংঘটনের কারণ সমাজে বস্তুবাদী চিন্তার ব্যাপক প্রসার এবং মহানবীর জীবনাদর্শ সম্পর্কে অজ্ঞতা। গৃহকর্মীদের সাথে রাসূলুল্লাহ (স) এর আচরণ ও শিক্ষা সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পারলে এ সমস্যা বহুলাংশে রোধ করা সম্ভব। এবার আমরা বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) পারিবারিক জীবনে গৃহকর্মীদের সাথে কিরুপ আচরণ করেছেন তা তুলে ধরবো।

মানবজীবনকে সমস্যামুক্ত করার জন্য এবং কল্যাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই দয়াময় আল্লাহ বিশ্বমানবতার বন্ধু শ্রেষ্ঠতম মানুষ মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) কে পাঠিয়েছিলেন। রাসূল (স) ছিলেন এতিমের বন্ধু, গরিবের আশ্রয় ও নির্যাতিত মানুষের সবচেয়ে বড় সহায়। তিনি সকলের সাথে ভালো আচরণ করতেন, কারো সাথে খারাপ আচরণ করতেন না। অধীনস্থ ও গৃহকর্মীদের অধিকারের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। নবী করিম (স) মত্যু মুহূর্তে শেষ বাক্য হিসেবে বলে গেছেন: 'নামাজ, নামাজ। তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। মহানবী (স) বারবার এ কথা বলতে থাকেন'।[৩] তিনি বাস্তব জীবনেও এ নীতির অনুসরণ করে গেছেন। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما

'রাসূলুল্লাহ (স) কখনো কোনো বস্তু নারী এবং কোনো গৃহকর্মীকে হাত দিয়ে আঘাত করেননি'।[৪]

হযরত আনাস বিন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর খাদেম ছিলেন। গৃহকর্মীদের সাথে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আচরণ সম্পর্কে তার কাছ থেকেই জানা যাক। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের মানুষ। একদিন তিনি আমাকে এক প্রয়োজনে পাঠালেন। তখন আমি বলে ফেললাম আমি যেতে পারবো না। অথচ আমার মনে মনে ছিল নবী (স) যে ব্যাপারে আদেশ করেছিলেন আমি তা করবো। আনাস (রা) আরো বলেন, এরপর আমি বের হয়ে বাজারে খেলাধূলারত কিছু বাচ্চাদের অতিক্রম করছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) পেছন দিক থেকে আমার দু'কাধ ধরলেন। আমি তার দিকে ফিরে দেখলাম তিনি হাসছেন। এরপর আমাকে বললেন, হে উনাইস! (স্নেহের সম্বোধন) আমি তোমাকে যেখানে যেতে বলেছি সেখানে গিয়েছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ হে আল্লাহর রাসূল! আমি যাবো, অতঃপর আমি গেলাম। রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে মন্তব্য করে আনাস (রা) বলেন:

"আল্লাহর শপথ! আমি দীর্ঘ ছয় বছর কিংবা (কোন বর্ণনা অনুযায়ী) নয় বছর তাঁর খেদমত করেছি। কিন্তু আমার জানা নেই আমার কোনো কাজের ব্যাপারে তিনি বলেছেন, কেন কাজটি এভাবে করেছ? অথবা আমি কোন কাজ না করলে তিনি বলেছেন, কেন কাজটি এভাবে করোনি?" [৫]

---

* সহকারী অধ্যাপক, সাইন্সেস অব হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

অন্য বর্ণনাতে এসেছে,

خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين٬ فما قال لي: أف ولا: لم صنعت؟ ولا: ألا صنعت؟

আমি দশ বছর নবী (স)-এর সেবা করেছি। তিনি আমাকে (বিরক্ত হয়ে) উহ্ পর্যন্ত বলেননি এবং এটাও বলেননি: কেন এটা করেছ? এবং এটাও বলেননি কেন এটা করোনি? [৬]

রাসূলুল্লাহ (স) গৃহকর্মীদের ব্যাপারে এতটা যত্নশীল ছিলেন যে, তিনি তাদের বিবাহ শাদীর খোঁজও রাখতেন। যেমন, রবীয়া বিন কাব আল-আসলামী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) এর সেবক ছিলাম। একদিন নবী (স) আমাকে বললেন, তুমি বিবাহ করবে না? আমি বললাম, না হে আল্লাহর রাসূল আমি বিবাহ করতে চাই না। কারণ একজন নারীর ভরণপোষনের সামর্থ্য আমার নেই এবং এ বিষয়ে আপনাকেও ব্যস্ত করতে চাই না। অতঃপর তিনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিছুক্ষন পর তিনি আবার বললেন: তুমি বিবাহ করবে না? আমি বললাম, না হে আল্লাহর রাসূল আমি বিবাহ করতে চাই না। কারণ একজন নারীর ভরণপোষনের সামর্থ্য আমার নেই এবং এ বিষয়ে আপনাকেও ব্যস্ত করতে চাই না। অতঃপর তিনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর আমি মনে মনে চিন্তা করে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, দুনিয়া আখিরাতে আমার কল্যাণ বিষয়ে আপনি বেশি অবগত। তাই আপনি যা চান কিংবা পছন্দ করেন সে বিষয়ে আমাকে আদেশ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আনসারদের অমুক এলাকার অমুকের নিকট যাও। [৭]

রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই মমত্ববোধ অমুসলিম গৃহকর্মীদের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর খাদেম এক ইহুদি বালক ভীষন অসুস্থ হয়ে পড়লো। রাসূলুল্লাহ (স) তাকে দেখতে গেলেন এবং দেখা-শুনা করলেন। বালকটির মূমুর্ষ অবস্থায় তিনি তার সেবা শুশ্রূষা করলেন এবং তার মাথার পাশে বসে তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে আহবান করলেন। বালকটি জিজ্ঞাসার ভংগিতে তার পিতার দিকে তাকালো। তার পিতা তাকে বললো, আবুল কাশেমের (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ স) আনুগত্য করো। এরপর সে ঈমান আনলো এবং তার রূহ চলে গেল। অতপর রাসূলুল্লাহ (স) বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচালেন। [৮]

মানুষকে কিভাবে সম্বোধন করা হয় তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের দেশে গৃহকর্তাদের অনেকে এমনকি তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বয়স্ক নারী গৃহকর্মীকে তুমি কিংবা বুয়া বলে সম্ভোধন করার প্রচলন রয়েছে। বুয়া শব্দটির উৎপত্তি যাই হোক না কেন, বর্তমানে তা তুচ্ছার্থেই ব্যবহৃত হয়। অথচ পৃথিবীতে কেউ গৃহকর্মী হিসেবে জন্ম গ্রহণ করে না। দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের আশায় অন্যের বাসায় কাজ করতে গিয়ে তাদের নাম হয় বুয়া। এটি মোটেই কাম্য নয়। রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে সম্মানজনকভাবে সম্ভোধন করতেন। বর্ণিত আছে তিনি তাঁর গৃহকর্মী আনাস বিন মালিক (রা) কে হে আমার ছেলে বলে সম্বোধন করেছেন। আমরা তাদেরকে তাদের নাম ধরে ডাকতে পারি, চাচা খালা ইত্যাদি সম্মানজনক শব্দে সম্বোধন করতে পারি।

রাসূলুল্লাহ (স) এর কথা ও কাজসমুহ বিশ্লেষণ করলে গৃহশ্রমিকদের বিষয়ে তাঁর যে শিক্ষাগুলো পাওয়া যায় তা হলো:

১. গৃহকর্মীরা পরিবারের সদস্যতুল্য গণ্য হবে। তাদের সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক থাকবে, মালিক ও ভৃত্যের সম্পর্ক নয়।

২. পরিবারের সদস্যরা যা খাবে, তারাও তাই খাবে। পরিবারের সদস্যরা যা পরবে তাদেরও সে ধরনের পোশাক দিতে হবে। মাঝে মধ্যেই তাদেরকে নিজেদের সাথে খাবার খেতে ডাকতে হবে।

৩. সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ তাদের ওপর চাপানো যাবে না। যদি দেয়া হয় তবে তাকে যথেষ্ট সময় দিতে হবে ও সক্রিয় সহযোগিতা করতে হবে।

৪. সকল মানুষেরই ভূল হতে পারে। গৃহকর্মীদের ভূল হতে পারে। এক্ষেত্রে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তাদের প্রতি ইনসাফ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স) একজন প্রশ্নকারীর জবাবে বলেছেন, প্রয়োজন হলে প্রতিদিন তাদেরকে সত্তরবার ক্ষমা করবে।

৫. গৃহকর্মীগণ গৃহকর্তার কাছ থেকে উত্তম ও মানবিক আচরণ পাওয়ার অধিকারী।

৬. পারিশ্রমিক প্রদানে গড়িমসি করা যাবে না, যথাসম্ভব দ্রুত তা পরিশোধ করতে হবে।

৭. ইসলাম শুধুমাত্র গৃহকর্মী নির্যাতন প্রতিরোধে নির্দেশ জারি করেই ক্ষান্ত হয়নি; তাদের প্রতি সদাচারের জন্য ব্যাপক হারে উৎসাহ প্রদান করেছে, যা মনস্তাত্বিক দিক থেকে অত্যন্ত কার্যকরী।

৮. সর্বোপরি আখেরাতের ভয়াবহ দিনের কথা হৃদয়ে স্মরণ রেখে অধীনস্থদের প্রতি ইনসাফ বা সুবিচার করতে হবে।

সবশেষে বলা যায়, ইসলাম প্রতিটি ব্যক্তিকে আল্লাহর বান্দা হিসেবে মূল্যায়ন করতে শেখায়। দারিদ্রতার কারণে মানবিক মর্যাদায় কোনো পার্থক্য করা যায় না। নিয়োগকর্তারা যদি গৃহকর্মী ও নিজেদেরকে একই রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে সমমর্যাদার অধিকারী মনে করেন এবং গৃহকর্মীদের সেবাটাকে নিজেদের জন্য আশীর্বাদ মনে করেন তাহলেই অত্যাচার নিপীড়নের পরিস্থিতি উদ্ভব হবে না। তাছাড়া গৃহকর্মীদের উপর ন্যূনতম অবিচার করলে পরকালে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে এই বিশ্বাস নিয়োগদাতাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারলে গৃহকর্মী নির্যাতন অনেকাংশেই হ্রাস পাবে। সেই সাথে দরকার নিরবচ্ছিন্ন আইনী প্রতিকারের পরিবেশ। গৃহকর্মীর কোন অপরাধ থাকলে তাকে আইনের হাতে সোপর্দ করা উচিত। পরিশেষে বলতে চাই, সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই লক্ষ লক্ষ গৃহকর্মীদের জন্য বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা ও সরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন। কিন্তু মানবাধিকার সংরক্ষণে মহানবী (স) এর শিক্ষার অনুসরণই এ সমস্যার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান, সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র ঃ

১। লেখক মন্ডলী, ডমেস্টিক ওয়ার্কার্স এক্রোজ দ্যা ওয়ার্ল্ড (জেনেভা : ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগেনাইজেশন/আইএলও, ২০১০ ইং)।
২। বুলেটিন, আইন ও সালিস কেন্দ্র, মার্চ ২০১৬ ।
৩। আহমদ, মুসনাদ, বাবঃ হাদিসু উম্মে সালমা, হাদীস নং. ২৬৭৭০।
৪। মুসলিম, আস-সহীহ, কিতাবুল ফাদায়েল, বাবঃ মুবাআ'দাতুহু সা. লিল-আছাম, হাদীস নং ২৩২৮।
৫। মুসলিম, আস-সহীহ, কিতাবুল ফাদায়েল, বাবঃ কানা রাসূলুল্লাহ আহসানুন নাছি খুলুকান, হাদীস নং ২৩১০।
৬। মুসলিম, আস-সহীহ, কিতাবুল ফাদায়েল, বাবঃ কানা রাসূলুল্লাহ আহসানুন নাছি খুলুকান, হাদীস নং ২৩০৯।
৭। আহমদ, মুসনাদ, খ. ৪, পৃষ্ঠা : ৫৮, হাদীস নং ১৬৬২৭।
৮। বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল, আস-সহীহ, খ. ১, কিতাবুল জানায়েয, বাব নং. ৭৮, হাদীস নং. ১২৯০।

আদর্শ না তরবারি ?

মারিয়া বিনতে ফারুক

ইসলাম একমাত্র ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। শান্তি, শাস্তি, উদারতা ও কঠোরতার এক অসাধারণ সম্মিলন ঘটেছে এই দ্বীনে। শুধু উদারনীতি প্রয়োগ করে কোনো মতবাদ টিকতে পারেনি। এই জন্যই দেখা যায় উদারনীতির সবক শেখানো মতবাদগুলোই পৃথিবীতে সবচেয়ে ভয়ংকর ইতিহাস রচনা করেছে। এই জন্য প্রয়োজন উদারতা ও কঠোরতার সমন্বয়। যা কেবল ইসলামেই রয়েছে। এই দ্বীনের প্রতিষ্ঠায় সর্বদা পথপ্রদর্শনকারী হিসেবে ছিল কিতাব ও তরবারি। আল্লাহ তায়ালা কিতাবের সাথে নাযিল করেছেন হাদিদ (লোহা)। যারা কিতাব মানবে না তাদের শিফা স্বরপ। এটাই ছিল সাহাবাদের মত। সালাফুস সালেহীনও ছিলেন এ মতের উপর। আল্লাহ বলেন-

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد حين بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الذين من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى عزيز.

আমি স্পষ্ট নিদর্শনসহ আমার রাসূলদেরকে পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদন্ড দিয়েছি যাতে মানুষ সুবিচার করে। আমি লোহাও দিয়েছি। যার মধ্যে (যুদ্ধের জন্য সহায়ক) প্রচন্ড শক্তি ও মানুষের জন্য অনেক কল্যাণ রয়েছে। এই জন্য যে, আল্লাহ জানতে (যাচাই করতে) চান কে না দেখেও তাকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিধর পরাক্রমশালী (৫৭:২৫) রাসূল (স) বলেছেন:

بعثت بين يدى الساعة بالسيف يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم.

আমি কিয়ামতের পূর্বে তরবারি সহকারে এ উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি যে, কেবল মাত্র এক আল্লাহরই ইবাদত করা হবে। আর আমার রিযিক রাখা হয়েছে বর্শার ছায়াতলে। যারা আমার আদেশের বিরুদ্ধে যাবে তাদের জন্য অপমান (আর লাঞ্চনা) নির্ধারিত রয়েছে। আর যে কেউ তাদের অনুকরণ করে সে তাদেরই একজন। [আহমদ ঃ ৪৮৬৯, বুখারিতে তা'লিক হিসেবে বর্ণিত] তিনি আরও বলেছেন :

أنا نبي الرحمة.... وأنا نبي الملحمة.

আমি রহমতের নবী, আমি যুদ্ধের নবী। [যাদুল মায়াদ: ১/৮৮] তাঁর সাহাবীগণও এই মত ধারণ করেছিলেন। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) একবার এক হাতে কুরআন অপর হাতে তরবারি নিয়ে ঘোষণা করেছিলেন। “রাসুল (স) আমাদের আদেশ করেছেন এটা (কুরআন) থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে তাদেরকে এটা (তরবারি) দিয়ে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য” [তারিখু ইবনে আসাকির ৫২/২৭৯]

তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির কল্যানের জন্যই তোমাদের উদ্ভব করা হয়েছে...[কুরআন ৩/১১০] এই আয়াতটি সম্পর্কে আবু হুরাইরা (র) বলেন “মানুষের জন্য মানুষ কল্যাণকর তখনই হয় যখন তাদের গ্রীবাদেশে শিকল লাগিয়ে নিয়ে আসা হয়। এরপর তারা ইসলামে প্রবেশ করে” [সাহীহ বুখারী ঃ ৪৫৭৭]

এবার আসা যাক সালাফদের কথায়। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রা) বলেছেন “আনুগত্য হবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। আর আল্লাহর কালিমা হবে সমুন্নত। আল্লাহর কালাম হচ্ছে সর্বব্যাপী। আল্লাহ বলেন, আমি আমার রাসূলদের প্রেরণ করেছি সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি। যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।” [কুরআন : ৫৭/২৫]

নবী রাসূল প্রেরণ ও কিতাব নাযিলের মাকসাদ হচ্ছে মানবজাতি যেন আল্লাহর হক ও বান্দার হকের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর আমি নাযিল করেছি লোহা, যাতে রয়েছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে না দেখে তাকে ও তার রাসূলগণকে সাহায্য করে।

---

* ৭ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী, সাইন্সে অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

কাজেই যে বিচ্যুত হয়ে পড়ে আল্লাহর কিতাবের পথ হতে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে লৌহের শক্তি দ্বারা। এ ভাবেই এই দ্বীনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা পায় কিতাবের আদর্শ ও তরবারির মাধ্যমে। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যার আরেকটি প্রসিদ্ধ মত আছে-

فالكتاب يهدي والسيف ينصر

'কিতাব হলো পথপ্রদর্শক আর তরবারি সাহায্যকারী'।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যুম বলেন আল্লাহ তার রাসূলকে কিয়ামাতের পূর্বে প্রেরণ করেছেন হিদায়েতের কিতাব ও বিজয়ী তরবারি সহকারে, যেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা হয় শরিকবিহীন অবস্থায়। আর তার রিয্ক নির্ধারিত হয়েছিল তরবারি ও বর্শায় ছায়াতলে। আল্লাহ তায়ালা তার এই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। একদিকে দলিল প্রমাণ আর অন্যদিকে তরবারি ও বর্শা। এই দু'টো বিষয় এমন ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যার একটি থেকে অপরটি আলাদা করা যায় না। [আল-ফারুসিয়্যাহ, পৃঃ ১৮]

প্রজন্ম পরম্পরায় মুসলিম উম্মাহ অবিচ্ছিন্নভাবে দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে এই মতই ধারণ করছিল। মুসলিমরা কখনোই কাফিরদের থেকে উদার নীতির সবক শিখেনি। কাফিররা এই সাহসও করতে পারেনি। কারণ কিতাব ও তরবারির প্রয়োগের বাস্তব নমুনা তখন উপস্থিত ছিল।

কিন্তু কিতাব থেকে যখন তরবারি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে, তখন চারদিক থেকে উম্মাহর পতনের খবরই ভেসে আসছিলো শত্রুরা নতুন এক ফাঁদ পাতল। মুস্তাশরিকিন বা ওরিয়েন্টালিস্টদের পলিসি সম্পর্কে যাদের ধারনা আছে তারা বুঝতে পারবেন, ইসলামের এই প্রকৃত রূপটা তাদের কাছে খুবই অপ্রীতিকর। শঙ্কার কারণ ও বটে। তাই তারা প্রথমে ইসলামের এই রূপটা চিহ্নিত করলো আর আদর্শ ও সংগ্রাম এই দুটি বিষয়কে দুই মেরুতে নিয়ে দাঁড় করালো। প্রশ্ন তৈরী করলো ইসলাম কি আদর্শের জোরে প্রসার লাভ করেছে না তরবারির জোরে? অথচ এই প্রশ্নটার মধ্যেই আছে মারাত্মক চতুরতা। এর মানে দাঁড়াচ্ছে যে, আপনাকে যে কোন একটি বেছে নিতে হবে। হয় আদর্শ নয় তরবারি। আবার তারাই এর সমাধান দিল। এক নয়া সহনশীল উদারনৈতিক অহিংস, কোনো শান্তি বাদী ইসলামের প্রচার শুরু করলো!

প্রাচ্যবিদ থমাস আরনল্ড তার الدعوة إلى الإسلام গ্রন্থে লিখেছেন :

إن الإسلام لم ينتشر بالسيف وإنما انتشر بالدعوة السليمة المبترئة من كل قوة

"ইসলাম তরবারির মাধ্যমে প্রসারিত হয়নি। বরং শান্তিপূর্ণ দাওয়াতের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে। কোনো ধরনের শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই"।

ধর্মনিরপেক্ষতার জয় জয়কারের যুগে পরাজিত মানসিকতার বহু ইসলামিস্ট নিজেদেরকে সাধু প্রমাণার্থে চতুরতাপূর্ণ এই স্লোগানকেই আঁকড়ে ধরলো। তারাও ওরিয়েন্টলিস্টদের সহযোগী হয়ে সে নয়া ইসলাম প্রচারে নেমে পড়লো। তাই কুরআন সুন্নাহর আদিল্লাহ, আসহাবে রাসূল ও আসলাফ আল-ইসলামের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং দ্বীনের সমস্ত উসুল ও উসলুবকে পাশ কাটিয়ে বলতে লাগল "না না ইসলাম উদারতা, সহিষ্ণুতা, অহিংসতা আর শান্তির ধর্ম। ইসলাম শুধুমাত্র তার অন্তর্নিহিত আদর্শের বলেই প্রসার লাভ করেছে। আর যা কিছু যুদ্ধ হয়েছে তা ছিল আত্মরক্ষামূলক, আক্রমনাত্মক নয়।

এই শতাব্দির অন্যতম একটি ফিতনাহ হলো তথাকথিত পীসফুল এই "মডারেট ইসলাম" যা সম্রাট আকবরের দ্বীন-ই-এলাহীর চেয়েও ভয়ংকর। ইসলামকে বুঝতে হবে কুরআন, সুন্নাহ ও পূর্বসূরীদের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কোনো বিশ্ব শক্তির চাহিদার ভিত্তিতে নয়। এ বিষয়ে মুসমলানদের আরো সতর্ক ও সচেতন থাকা জরুরী।

বাংলা ভাষায় রচিত হাদিস শাস্ত্রের তত্ত্ব ও ইতিহাসমূলক গ্রন্থ পরিচিতি

আবু ছালেহ মুহাম্মদ ইউসুফ

ভূমিকা ঃ পবিত্র কুরআনে কারীমের পর সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মর্যাদাপূর্ণ, তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞান হচ্ছে হাদিস শাস্ত্রের জ্ঞান। এজন্য হাদিস অধ্যয়ন ও তদানুযায়ী আমল করা মুসলিম জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ। সুতরাং কুরআনের মত হাদিসও সংরক্ষণ করা একান্ত জরুরী। হাদিস লিখন প্রথমে নিষেধ করা হলেও পরবর্তীতে মহানবী (স) এর জীবদ্দশায় লিখিত ভাবে হাদিস সংরক্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে খলিফা ওমর ইবনে আব্দিল আযিয (র) হাদিস লিপিবদ্ধ করার সরকারী ফরমান জারী করার পর থেকে হাদিস লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী সাড়া পড়ে। আর হিজরী তৃতীয় শতাব্দীকে হাদিস সংকলনের স্বর্ণযুগ বলা হয়। সোনারগাঁও-এ হাদিস শিক্ষাদানকারী এদেশের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক মুহাদ্দিস শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (মৃত. ১৩০০ খ্রিঃ) এর হাত ধরেই বঙ্গে হাদিস চর্চার সূচনা। আরবী ও অন্যান্য ভাষায় অসংখ্য হাদিস শাস্ত্রের তত্ত্ব ও ইতিহাস সম্পর্কিত বই পাওয়া গেলেও বাংলা ভাষায় ১৯৬০ সালের পূর্বে এ সংক্রান্ত কোনো বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। নিম্নে বাংলায় রচিত ও অনূদিত উল্লেখযোগ্য কিছু হাদিসের তত্ত্ব ও ইতিহাস সংক্রান্ত বইয়ের পরিচিতি তুলে ধরা হলো-

সরাসরি বাংলা ভাষায় লিখিত কিতাব

১। হাদিসের তত্ত্ব ও ইতিহাস : লেখক - মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আজমী [১] (১৯০০-১৯৭২)। এটি বাংলা ভাষায় রচিত হাদিস শাস্ত্রের তত্ত্ব ও ইতিহাস সম্পর্কিত প্রথম বই। গ্রন্থটি দুই খন্ডে বিভক্ত। এর মধ্যে বিশেষ বিশেষ শিরোনাম নিম্নরূপ- ছুন্নাহ বা হাদীস ঃ উৎস, শ্রেণি বিভাগ, হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা।

হাদিসের কিতাব ঃ স্তর ও শ্রেণী বিন্যাস সহীহাইনের বাহিরেও সহীহ হাদিস আছে, হাদিসের সংখ্যা, শরীয়তে সুন্নতের স্থান।

হাদিস ঃ হেফাজত, শিক্ষাকরণ, লিখন, আমলকরণ, হাদীস লেখার ক্রমবিকাশ, তাবেয়ী ও তবে তাবেয়ীদের হাদিস শিক্ষাকরণ ও লিখন ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, সিহাহ সিত্তাহ সংকলক ও সংকলন প্রসঙ্গ, হাদীস জাল ও প্রতিকার, জরাহ ও তা'দীলকারী কতিপয় প্রসিদ্ধ ইমাম, কতিপয় প্রসিদ্ধ কিতাব।

এর দ্বিতীয় খন্ড ইতিহাসমূলক, এতে রয়েছে পাক-ভারতে ইলমে হাদিস, বর্তমানের কতিপয় মুহাদ্দিস, বঙ্গে ইলমে হাদিস ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যবহুল আলোচনা। এর বঙ্গে ইলমে হাদিস অধ্যায়ে জীবিত ও মৃত ২৯৯ জন মুহাদ্দিস সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা রয়েছে । গ্রন্থের শেষাংশে রয়েছে বাংলাদেশের ৪১টি বড় বড় মাদ্রাসা সংক্ষিপ্ত বিবরণ। বাংলাদেশে হাদিস চর্চার ইতিহাসে এ গ্রন্থটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাক-ভারত ও বঙ্গে ইলমে হাদীস অংশে মুহাদ্দিসদের জীবনী তুলে ধরার জন্য লেখক যথেষ্ট কষ্ট করেছেন। ফলে গ্রন্থটি পাঠক সমাজের নিকট অতি পরিচিতি লাভ করেছে। বইটি এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লিঃ ঢাকা থেকে প্রকাশিত, বইটির সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৩।

২। হাদিসের হিফাজত ও সংকলন ঃ লেখক মুহাম্মাদ হারুন আজিজী। গ্রন্থটিতে হাদিসেরর সংজ্ঞা ও পরিচয়, হাদিসের হিফাজত, ভারতবর্ষে ইলমে হাদিস, বাংলায় ইলমে হাদিস, কতিপয় পরলোকগত বাঙ্গালী মুহাদ্দিস, কতিপয় জীবিত মুহাদ্দিস ও আরো কিছু প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, বাংলাদেশের কতিপয় প্রসিদ্ধ হাদিস শিক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদি অধ্যায়ে বিভক্ত।

এ গ্রন্থে লেখক সুন্নাত, খবর, আছর, মুহাদ্দিস, হাফিজ, হাদিসের শ্রেণি বিভাগ, হাদিসের গুরুত্ব ও প্রামাণিকতা, সাহাবা যুগে হাদিস চর্চা, তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী ও পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের যুগে হাদিস লিখনে সাহাবী ও মহিলা সাহাবীদের অবদান, তাবেয়ীগণের যুগে লিখিত হাদিস সর্ম্পকে ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

বাংলায় ইলমে হাদীস অধ্যায়ে লেখক জীবিত ও মৃত সর্বমোট ৭৯ জন মুহাদ্দিসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছেন।

---

* ৬ষ্ঠ সেমিস্টারের শিক্ষার্থী, সাইন্সেস অব হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

যদিও বইটি মাওলানা নুর মুহাম্মদ আজমীর রচিত 'হাদিসের তত্ত্ব ও ইতিহাস' এর অনুকরণে লিখিত। তবে এখানে লেখকের মৌলিকত্ব কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। ফলে এই বই পাঠকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সংগ্রহে রাখার মত। বইটির সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৮।

৩। হাদীস সংকলনের ইতিহাস ঃ লেখক মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (রহঃ) (১৯১৮-১৯৮৭)।[২] এ গ্রন্থে হাদিস প্রসঙ্গে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে থেকে বিশেষ কিছু অধ্যায়ের শিরোনাম তুলে ধরা হল–

হাদিস ঃ সংজ্ঞা, প্রকরণ,বিষয়বস্তু, সনদ ও মতন, হাদিস কুদসী, অধ্যয়নের উদ্দেশ্য কুরআন ও হাদীসের পার্থক্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় হাদিসের গুরুত্ব। হাদীস সংরক্ষন, হাদিস গ্রন্থ সংকলন, হিজরী তৃতীয় শতকে হাদিস চর্চা, মুসনাদ প্রণয়ন, হাদিস সংকলনের চূড়ান্ত পর্যায়, ছয়খানা বিশিষ্ট হাদিস গ্রন্থ, চতুর্থ শতকে ইলমে হাদিস, চতুর্থ শতকের পরে হাদিস গ্রন্থ প্রনয়ণ, সপ্তম ও অষ্টম শতকে হাদিস চর্চা, বিভিন্ন দেশে হাদিস চর্চা হাদীস গ্রন্থসমূহের পর্যায় বিভাগ, হাদিস জালকরণ, ইহার কারণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা, হাদিস সমালোচনার পদ্ধতি, হাদীস বর্ণনাকারীদের শ্রেণী বিন্যাস, পাক-ভারতে ইলমে হাদিস, বঙ্গদেশে ইলমে হাদিস, ইলমে হাদিস বনাম অমুসলিম মনীষীবৃন্দ ইত্যাদি।

এ গ্রন্থে আলোচিত বিষয়সমূহ তথ্যসমৃদ্ধ এবং প্রতিটি মতামতের পক্ষে কুরআন-হাদিসের প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে। বাংলা ভাষায় ইতঃপূর্বে হাদিস সংকলনের ইতিহাসের উপর এ ধরনের বিশাল গ্রন্থ রচিত হয়নি।

বইটি বাংলা একাডেমী ১৯৭০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৯২ এবং সর্বশেষ খাইরুন প্রকাশনী থেকে ২০১৬ সালে ১৬ তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৯২।

৪। আস সিহাহ আস-সিত্তাহ পরিচিতি ও পর্যালোচনা ঃ বইটি আট অধ্যায়ে সম্বলিত। প্রথম অধ্যায়ে হাদিস পরিচিতি, সংকলন, হাদিস গ্রন্থের শ্রেণী বিভাগ উল্লেখসহ অন্যান্য অধ্যায়ে কুতুবুস সিত্তাহ সংকলকদের জীবনী, তাদের সম্পর্কে মনীষীদের অভিমত, কুতুবুস সিত্তাহর বৈশিষ্ট্য এবং পর্যালোচনা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। লেখক ড. মাহবুবুর রহমান (জন্ম- ১৯৭৩), অধ্যাপক (ইসলামিক স্টাডিজ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। বইটির প্রকাশনায় আল মাকতাবাতুশ শাফিয়া : রাজশাহী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২০।

৫। বাংলাদেশে হাদিস চর্চাঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে মুহাদ্দিস, মাদ্রাসা এবং হাদিস বিষয়ক গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কিত এটিই পূর্ণাঙ্গ গবেষণাধর্মী গ্রন্থ। এতে গবেষক আলিয়া ও কওমী উভয় ধারার ২৪০ জন মুহাদ্দিস, ৭১টি আলিয়া ও ৫১টি কওমী মাদ্রাসা, সেই সাথে ৬টি সরকারী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত (২০০০ সাল পর্যন্ত) হাদিস সম্পর্কীয় ১৫১টি বই সর্ম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাছাড়া বাংলাদেশে ইসলামের আবিভার্ব, মুসলিম সমাজ গঠন, হাদিস শিক্ষার সূচনা এবং কুতুবুস সিত্তাহ সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক ও গবেষক ড. প্রফেসর আহসান উল্লাহ (আহসান সাইয়েদ)[৩] উক্ত শিরোনামে অভিসন্দর্ভের জন্য ২০০১ সালে পি এইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তবে লেখকের শুধু ডিগ্রি অর্জন এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল না বরং বাংলাদেশ নামক এ ভূখন্ডে প্রাচীনকালে ইসলামের আর্বিভাবের পর থেকে অদ্যাবধি হাদিস শিক্ষায় যাঁরা বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন সে পূণ্যবান আলিমগণের জীবন ও কর্ম এবং অধুনালুপ্ত ও চলমান আলীয়া মাদ্রাসা ও কওমি মাদ্রাসার অবদান ইতিহাস আকারে লিপিবদ্ধ করাও ছিল গবেষকের মহান উদ্দেশ্য। বইটি অ্যাডর্ন পাবলিকেশন ২০০৬ সালে প্রথম প্রকাশ করে, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৮। বর্তমানে তিনি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পদে কর্মরত আছেন।

আসমাউর রিজাল বা রাবী পরিচিতি মূলক গ্রন্থ

হাদিস শাস্ত্রকে দু'টি প্রধান অংশে ভাগ করা হয়েছে ঃ ১। সনদ ২। মতন

'মতন' আমরা যতটুকুই অনুধাবন করার চেষ্টা করি সে বিচারে সনদ সম্পর্কে বরাবরই উদাসীন থাকি। আমরা জানি, হাদিসের মূল বক্তব্যকে 'মতন' বলে। আর রাসূল (স) থেকে আমাদের পর্যন্ত হাদিস পৌঁছার যে রাস্তা/পদ্ধতি রয়েছে সেটাকে 'সনদ' নামে অভিহিত করা হয়। এসব বিষয় বিবেচনা করে প্রায় ১৫০ জন প্রসিদ্ধ রাবীর জীবনী লিখেছেন আ.ন.ম মাঈন উদ্দীন সিরাজী (সাবেক মুহাদ্দিস, আলম শাহ পাড়া কামিল মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম। বইটির নাম **আসমাউর রিজাল (রাবী চরিত)**। বইটি প্রকাশ করে আল বারাকা লাইব্রেরী। বইটিকে তিনি এগার অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। ১ম অধ্যায়ে খুলাফায়ে রাশেদীন, ২য় অধ্যায়ে আল মুকছিরুন সাত জন, ৩য় অধ্যায়ে আল মুতাওয়াচ্ছিতুন ৪চার জন, ৪র্থ অধ্যায়ে আল মুকিল্লুন একুশ জন, পঞ্চম অধ্যায়ে আল আক্বাল্লুন উনপঞ্চাশ জন, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বাইয়াতে আকাবা থেকে নির্বাচিত ১২ জন নকিব, সপ্তম অধ্যায়ে রাসূল (স) এর ১১ জন সহধর্মিণীগণ, অষ্টম অধ্যায়ে মহানবী (স) এর ৪ জন কন্যা ও ১১ জন সাধারণ মহিলা সাহাবীদের জীবনী। নবম

অধ্যায়ে ১৭ জন বিশিষ্ট তাবেয়ী ও তাবেতাবেয়ী ১০ম অধ্যায়ে কুতুবুস সিত্তাহ প্রণয়নকারী এবং সর্বশেষ অধ্যায়ে চার মাযহাবের প্রসিদ্ধ ৪ জন ইমামের জীবনী অত্যন্ত সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। বইটি আকারে ছোট হলেও তথ্য বহুল ও অতি মূল্যবান।

আসহাবে রাসূলের জীবন কথা (৬ খন্ড) ঃ লেখক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রফেসর, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এ বই সরাসরি হাদিস গ্রন্থ নয়। তবে এতে হাদিস সংরক্ষণকারী ও হাদীস বর্ণনাকারী অনেক সাহাবীর জীবনলেখ্য রয়েছে। হাদিস পাঠের সময় রাবী সম্পর্কে জানতে হলে এ বই খুবই উপকারী। এই বইটি ৬ খন্ডে লিখিত। ১ম খন্ডে সাহাবাগণের পরিচয় সম্পর্কে ৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী সুদীর্ঘ ভূমিকা উল্লেখ্য। অতঃপর ১ম খন্ডে ৩০ জন, ২য় খন্ডে ৬২ জন, ৪র্থ খন্ডে ৩৯ জন, ৫ম খন্ডে ১১ জন উম্মাহাতুল মুমিমীন, ৬ষ্ঠ খন্ডে ৩৬ জন মহিলা সাহাবি ও ৩য় খন্ডে মদিনার আনসারদের পরিচয় এবং ২০ জন সাহাবীগণের জীবনী ও তাদের কার্যবলী সুচারুরূপে উপস্থাপন করেছেন। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, কাঁটাবন ঢাকা এর প্রকাশনায় ১৯৮৭ সাল থেকে উক্ত বইয়ের খন্ডগুলো ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে।

অন্য ভাষা থেকে বাংলায় অনূদিত

* **India's Contribution to the study to Hadith Literature**: বইটি ইংরেজী ভাষায় রচিত। লেখক: ড.মোহাম্মাদ ইসহাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উক্ত শিরোনামে অভিসন্দর্ভ পেশ করে ১৯৪৭ সালে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। এতে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে সাহাবায়ে কিরামগণের আগমন, সিন্ধুতে হাদিস চর্চার বিভিন্ন পর্যায়, উত্তর ভারতে হাদিস চর্চা, ভারতীয় উপমহাদেশে ইলমে হাদিসের রেঁনেসা ও হাদিস কেন্দ্রের বিকাশধারা এবং বহিঃর্ভারতে ও ভারতীয় মুহাদ্দিসগণের নাম বিশেষ ভাবে স্থান পেয়েছে । ১৯৯৩ সালে 'ইলমে হাদিসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান' শীর্ষক একটি বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে ।

***বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন ঃ** ফার্সী ভাষার রচিত হাদিস চর্চা বিষয়ক একটি মূল্যবান গ্রন্থ। লেখক ভারতীয় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্ব শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ:) (১৭৪৬-১৮২৩)। তাঁর পিতা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র) (১৭০৩-১৭৬২) ছিলেন তৎকালীন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ও মুজতাহিদ।

গ্রন্থটিতে হাদিস, মুহাদ্দিস, হাদিসের ৯৫টি গ্রন্থের পর্যালোচনা সহ এসবের চর্চা ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে। এই মূল্যবান বইটি অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক ড.আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দীক এবং মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী। ২৮৮ পৃষ্ঠার এই বইটি ৩য় বারের মত বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশ করেছে।

***তাইসীরু মুস্তালাহুল হাদীস ঃ** আরবী ভাষায় লিখিত উসূলুল হাদিসের এক মূল্যবান কিতাব। মূল লেখক ড. মাহমুদ তাহহান। বইটি আমাদের শরীয়া ফ্যাকাল্টি সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্‌রাসায় ফাযিল এবং অর্নাসের সিলেবাসভূক্ত। বাংলা ভাষায় কিছু সংযোজনসহ গ্রন্থটি ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে উসূলুল হাদিসের পরিচিতি ও বিকাশ, হাদিসের বিভিন্ন পরিভাষা ও প্রকারভেদ, হাদিস সংকলনের ইতিহাস, কুতুবুস সিত্তাহ ইমামগণের জীবনী, সর্বশেষে হাদিসের মর্যাদা ও অবস্থান সর্ম্পকে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বইটি অনুবাদ করেছেন প্রফেসর ড. শফিকুল ইসলাম।

উপসংহার ঃ পরিশেষে বলা যায়, ইলমে হাদিসের জ্ঞানার্জন ও সে অনুযায়ী আমল করা এবং তত্ত্বীয় হাদিস শাস্ত্রের তত্ত্ব, ইতিহাস ও সংকলন সম্পর্কে জানা যেমন অতীব দরকার তেমনিভাবে হাদিসের সনদ, মতনের বিশ্লেষণ, হাদিসের শুদ্ধাশুদ্ধি নিরূপণ ও যাচাই-বাছাইয়ের জন্য উসূলুল হাদীস জানাও একান্ত জরুরী।

টিকা -

১। মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (রহ:) ফেনী জিলার সিলোনিয়াস্থ নিয়াজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শায়খ আলী আজম ও মাতার নাম রহীমুন্নেসা। তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসা থেকে ১৯২৫ সালে উলা (ফাযিল) পাশ করেন। মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী ১৯২৭ সালে নোয়াখালীর বালুয়া চৌমূহনী মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর তিনি উক্ত মাদ্‌রাসা ত্যাগ করে ফেনী আলিয়া মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন। তিনি এ মাদ্‌রাসায় ১৯২৮-১৯৪৩ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। অতঃপর তিনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সাল এই দুই বৎসর কলিকাতা ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরী ও কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা লাইব্রেরীতে পড়াশুনা ও গবেষণা করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি লেখালেখি ও ইলমে হাদিসসহ অন্যান্য বিষয়ে গবেষণায় নিজেকে সম্পৃক্ত রাখেন। বাংলা ভাষায় হাদিস ও মুহাদ্দিস সম্পর্কে লেখালেখির ক্ষেত্রে তিনি অনন্য অবদান রাখেন। তাঁর রচিত 'হাদিসেছর তত্ত্ব ও ইতিহাস'এবং অনূদিত মেশকাত শরীফের বঙ্গানুবাদ, এ দুটি গ্রন্থ অতীব মূল্যাবান। এ ছাড়াও তিনি ইসলামী সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে ছোট-বড় সর্বমোট ৩৮টি গ্রন্থ রচনা করেন।

লেখালেখির পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কারের প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। তিনি ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত জমঈয়তুল মুদার্‌রিসীন (মাদ্‌রাসা শিক্ষক সমিতি) এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এ ছাড়া তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান তোলাবায়ে আরবিয়ার সভাপতিও ছিলেন। তিনি ১৯৭২ সালের ১৬ই আগষ্ট ইন্তিকাল করেন।

২। গত শতকের এক অসাধারণ ইসলামী প্রতিভা। একাধারে তিনি উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, সাবেক সংসদ সদস্য ও ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম (র) ১৯১৮ সালে ফিরোজপুরের কাউখালী উপজেলার শিয়ালকাটি উপজেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে শর্ষীনা আলীয় মাদ্‌রাসা থেকে আলিম ১৯৪০ ও ১৯৪২ সালে কলিকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসা থেকে যথাক্রমে ফাযিল ও কামিল পাশ করেন। আবার ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসায় কোরআন ও হাদিস সম্পর্কে উচ্চাতর গবেষণায় মগ্ন থাকেন। তিনি বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে শুধু পথিকৃতই ছিলেন না, ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০ টিরও বেশি অতুলনীয় গন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন', 'ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা',' ইসলামের অর্থনীতি', 'ইসলামী জিহাদ', 'সুন্নাত ও বিদয়াত', 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম', 'শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি', হাদীস শরীফ (৩ খন্ড) এসব গ্রন্থ দেশের সুধীমহলে প্রচন্ড আলোড়ন তুলেছে। তাছাড়া মৌলিক ও গবেষণা মূলক রচনার পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী মনীষীদের রচনাবলী বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারেও তার কোন জুড়ি নেই। মাওলানা আব্দুর রহিম বাংলাদেশসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) এর অন্তর্গত ফিকাহ একাডেমীর একমাত্র সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন ও রাবেতা আলমে ইসলামী সম্মেলন, ১৯৭৮ সালে কুয়ালামপুরে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলন এবং ১৯৮২ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামী বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই মনীষী ১৯৮৭ সালে ১লা অক্টোবর বৃহস্পতিবার ইন্তেকাল করেন।

৩। প্রফেসর আহসান সাইয়েদ ১৯৬৩ সালে দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাতকানিয়া জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহ্যবাহী সুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়ন শেষে অধ্যাপনায় যোগদান করেন এবং উক্ত শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনার মাধ্যমে ২০০১ সালে চবি থেকে পিএচডি ডিগ্রী লাভ করেন। ২০০৬ সালে অ্যাডর্ন পাবলিকেশন অভিসন্দর্ভটি গ্রন্থকারে ১৬৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে।

সহায়ক গ্রন্থ :

* প্রফেসর ড. আহসান সাইয়েদ ঃ বাংলাদেশে হাদিস চর্চা উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। প্রথম সংস্করণ, অ্যাডর্ণ পাবলিকেশন, ঢাকা-২০০৬ ইং।
* এ.এস.এম আজিজুল হক আনছারী ঃ মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা, ১৯৮৭ ইং।
* ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড ১৪/২১২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
* শায়খ যুলফিকার আহমদ কাসেমী : বাংলাদেশের সংগ্রামী আলেম ওলামা পীর মশায়েখ।
* উস্তাদ মুজহেরুল ইসলাম ঃ বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপথিক যারা।
* মিযান হারুন ঃ রিজালুন সানাউত তারিখ ওয়া খাদিমুল ইসলাম ওয়াল ইলম ফি বাংলাদেশ, দারুল বয়ান, ঢাকা-২০১৮ ইং।
* বিশেষ আলাপনী ঃ মাওলানা অলি আহমদ, (পিএইচডি গবেষক) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও (আরবী প্রভাষক) ঃ দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।

দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা : যৌক্তিকতা

খন্দকার আব্দুল গাফ্ফার

একটিই পৃথিবী। কিন্তু মানুষ অনেক। কেউ ছোট, কেউ বড়। আবার কেউ কৃষ্ণ, কেউ শ্বেত। কিংবা অনেকেই এই দুই বিভাজনের মাঝামাঝি প্রকৃতির। কারো সাথে কারোর মুখাবয়বের মিল নেই। মিল নেই কণ্ঠস্বরের। একইভাবে চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গিরও রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। যাকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয় দ্বিমত, মতভেদ, মতানৈক্য ও তর্ক-বিতর্ক। তবুও আমরা বেঁচে আছি, বেঁচে থাকবো। মিলেমিশে আছি, এভাবেই থাকবো। যা মূলত সর্বোশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালার কুদরতের ইশারা ও বৈচিত্রময় পৃথিবীর বৈচিত্রের বহিঃপ্রকাশ। এ দ্বিমতের ফলে আমরা খুব সহজেই সঠিক ও যুক্তিনির্ভর প্রমাণভিত্তিক বিশুদ্ধ পথ-পন্থা, মতটি গ্রহণ করতে পারি।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! সেই ধারাবাহিকতায় এই প্রবন্ধে আমরা একটি "চমৎকার বিতর্ক" নিয়ে পর্যালোচনা করবো। যা থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারবো যে, বিতর্কের বিষয়বস্তু কি ধরনের হয়? এবং কিভাবে রুচিশীল যৌক্তিক বির্তক করা যায়?

একবার ইমাম আজম আবু হানিফা (র) এবং ইমাম আওযায়ী (র) মক্কা মুকাররামার প্রসিদ্ধ জায়গা "দারুল নাহাতাইনে" উভয়ের সাক্ষাৎ হলে বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পরের মধ্যো আলোচনা শুরু হয়। এমনকি নামাজের প্রসিদ্ধ মাসয়ালা 'রফে ইয়াদাইন' এর বিষয়টিও বাদ যায়নি। তখন আলোচনার এক পর্যায়ে ইমাম আওযায়ী (র) ইমাম আবু হানিফা (র) কে জিজ্ঞেস করলেন: আপনারা নামাজে রুকু করার সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময় 'রফে ইয়াদাইন' করেন না কেনো? উত্তরে আবু হানিফা (র) বললেন: কারণ, এ ব্যাপারে রাসুল (স) থেকে প্রশ্নাতীত বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত রেওয়াত নেই। তখন ইমাম আওযায়ী (র) বললেন: কেনো নেই? আছে তো ! এই যে,

قد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول ﷺ: أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه (كما رواه الإمام الترمذي في الجامع)

ইবনে শিহাব জুহুরী: অর্থাৎ, ছালেম তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসুল (স) নামাযের শুরুতে, রুকুতে যেতে এবং রুকু হতে ওঠার সময় হাত উঠাতেন।

তখন এর বিপরীতে ইমাম আবু হানিফা (র) উল্লেখ করলেন:

حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود لشئ من ذلك....

অর্থাৎ: হযরত হাম্মাদ, ইব্রাহীম নাখয়ী, আলকামা ইবনে মাসউদ সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূল (স) শুধু সালাতের শুরুতে তাকবীর বলার সময় হাত উঠাতেন এবং পরবর্তীতে এর পুনরাবৃত্তি করতেন না।

উপরোক্ত হাদিসের বর্ণনা শুনে ইমাম আওযায়ী (র) আশ্চর্য হয়ে ইমাম আবু হানিফা (র) কে প্রশ্নবিদ্ধ করে বললেন: আমি আপনার নিকট হযরত ইমাম ইবনে শিহাব জুহুরী ছালেম হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে হাদিস বর্ণনা করলাম! আর আপনি হাম্মাদ-ইব্রাহীম নাখয়ী-আলকামা সূত্রে হাদিস বর্ণনা করছেন??

এখানে ইমাম আওযায়ী (র) এর আশ্চর্য হবার কারণ হলো, তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁর সনদটি বেশি শক্তিশালী। কারণ, তাঁর সনদে রাবীগণের সংখ্যা কম; যা মুহাদ্দীসগণের পরিভাষায় "সনদে আ'লী" হিসেবে সুপরিচিত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফার বর্ণিত সনদে রাবীগণের সংখ্যা বেশি তাই উহা "সনদে নাযিল" হবে। সুতরাং তাঁর মতে তাঁর বর্ণিত হাদিসটি বেশি প্রমাণযোগ্য হওয়ার দাবি রাখে।

তখন ইমাম আবু হানিফা (র) বক্তব্য শুনার পর চুপ করে বসে না থেকে বিনয়ের সাথে বললেন; হ্যাঁ ঠিক আছে, আপনার বর্ণিত হাদিসটির সনদ আ'লী হতে পারে কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে, যা সবারি জানা আছে,

كان حماد أفقه من الزهري وكان إبراهيم أفقه من سالم وعلقمة ليس بدون ابن عمر فى الفقه وإن كانت لابن عمر صحبة وله فضل آخر وعبد الله هو عبد الله ثم سكت عليه الأوزاعي.

* ৮ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী, সাইন্সেস অব হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

অর্থাৎ: হযরত হাম্মাদ ফিক্বাহশাস্ত্রে ইমাম জুরুরীর চেয়ে বেশি পারদর্শী ছিলেন এবং হযরত ইব্রাহীম নাখয়ী হযরত ছালেম থেকে বেশি পারদর্শী ছিলেন এবং হযরত আলক্বামা (র) হযরত ইবনে উমর (রা) এর চেয়ে ফিক্বহের ক্ষেত্রে কোনো দিক থেকে কম ছিলেন না। যদিও হযরত ইবনে উমর (রা.) সাহাবী ছিলেন। সে ক্ষেত্রে তাঁর মর্যাদা ভিন্ন। আর হযরত আব্দুল্লাহ তো আব্দুল্লাহ। তাঁর কথা আর কি বলবো। অতঃপর ইমাম আওযায়ী (রা) তাঁর আলোচনা দীর্ঘয়িত করেননি।

উপরোক্ত নাতিদীর্ঘ আলোচনায় হাদিসশাস্ত্রে নীতিনির্ধারকগণ ও বিশুদ্ধ হাদিস অনুসন্ধিৎসুদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ দিকনিদের্শনা রয়েছে। আমরা উপরিউক্ত বিতর্কটি বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবো যে, হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসীনের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হতে পারে। যেমনটি ঘটেছে ইমাম আবু হানিফা (রা) ও ইমাম আওযায়ী (রা) এর ক্ষেত্রে। ইমাম আওযায়ী হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে قوة الإسناد তথা সনদের শক্তিশালীতাকে প্রাধান্য দিতেন। এবং ইমাম আবু হানিফা (রা) فقه الرواة في السند তথা সনদের ক্ষেত্রে রাবীগণকে পান্ডিত্বের বিচারে প্রাধান্য দিতেন। তাই আমাদের সর্বপ্রথম হাদিসবিশারদগণের মানহাজ ও দৃষ্টিভঙ্গি জানতে হবে। কারোর দৃষ্টিভঙ্গি ও মূলনীতি নির্ধারনে তাঁর মানহাজ না জেনে একপেশে সমালোচনা করা ঠিক হবে না। যেমনটি ইমাম আবু হানিফ (র) কে নিয়ে করা হয়। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলের ইলমে বরকত দান করুন এবং তদানুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন।

হাদিসের আলোকে নৈতিক চরিত্র

এইচ. এম. মিজানুর রহমান

হাদিসের আলোকে জীবন গড়া সকল মুমিন মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। প্রত্যেকটি মানুষের সমস্ত জীবন কুরআন ও হাদিসের আলোকে হওয়া অপরিহার্য। একজন মানুষ তার প্রকৃত জ্ঞানটি ফুটিয়ে তুলতে পারে তার চরিত্রের মাধ্যমে। নবী করিম (স) এর আদর্শিত শিক্ষা হতে লক্ষ্য করা যায় যে, ঈমানের পর মানুষের নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব সর্বাধিক, এমনকি এটিকে মানুষের সঠিক কল্যাণের উৎস বলা হয়েছে। মানুষ সকল অসৎ চরিত্র হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। উত্তম ও উৎকৃষ্ট নৈতিক গুনাবলী গ্রহণ করবে। এটাই হলো মানুষের বৈশিষ্ট্য। ঈমানের পূর্ণতা উন্নত নৈতিক চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। যার চরিত্র যত বেশি উন্নত তার ঈমান তত বেশি পূর্ণ। রাসূলে করীম (স) এর আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো জনগনের "তাযকিয়া" করা অর্থাৎ মানুষের মন মগজ, চরিত্র ও কার্যবলীকে নির্মল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নিস্কুলুষ এবং সর্বপ্রকার ক্লেদ কালিমা মলিনতা হতে মুক্ত করে তোলা। রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ إن من خيارکم أحسنكم أخلاقا (بخاري ومسلم)

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (র) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, নবী করিম (স) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লোক হলো তারা, যাদের চরিত্র সকলের চেয়ে উত্তম (বুখারী ও মুসলিম)। আলোচ্য হাদিস হতে প্রমাণিত হয় যে, নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে যে লোক সর্বোত্তম, ইসলামের দৃষ্টিতে সেই হল উত্তম ব্যক্তি। অপর হাদিসে রাসূল (স) বলেছেন-

عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال ما من شئ أثقل فى ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وأن الله يبغض الفاحش البذي (ترمذي)

অর্থ: হযরত আবু দরদা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করিম (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন ঈমানদার বন্দার দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্র অপেক্ষা অধিক ভারী জিনিস আর কিছুই হবেনা। আর যে লোক বেহুদা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট ধরনের কথাবার্তা বলে, আল্লাহ তায়ালা তাকে মোটেই পছন্দ করে না। (তিরমিযী)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ব্যক্তির আমল ওজন করালে তার উত্তম চরিত্র অত্যন্ত ভারী হবে। কারণ ঈমান ও উত্তম নৈতিক চরিত্রের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যামান।

নৈতিক চরিত্রের গুরুত্বারোপ করে ইমাম মালেক (র) বর্ণনা করেন-

عن مالك أنه قد بلغه أن رسول الله ﷺ قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق (موطأ مالك)

অর্থাৎ: ইমাম মালিক হতে বর্ণিত : তাঁর নিকট এই খবর পৌঁছেছে যে, নবী করিম (স) ইরশাদ করেছেন আমাকে নৈতিক চরিত্র মাহাত্ম পরিপূর্ণ করার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। (মুয়াত্তা ইমাাম মালিক) রাসুল (স) আরো বলেছেন :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا (أبو داود)

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল কারীম (স) ইরশাদ করেছেন, ঈমানদার লোকদের মধ্যে ঈমানের দিক থেকে পূর্ণ ব্যক্তি সে, যে নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে তাদের মধ্যে উত্তম। (আবু দাউদ, দারেমী)

একজন মুমিনের ঈমানে পূর্ণতা তখনই হতে পারে যখন তারা নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে পূর্ণতা লাভ করতে পারবে। চারিত্রের প্রতি গুরুত্বারোপ করে একজন আমেরিকান নেতা উইলিয়াম ফ্রাংলিন বলেছেন,

* ১ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী, সাইন্সেস অব হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

"Money is lost, nothing is lost
health is lost, something is lost
character is lost, everything is lost"
সুতরাং
নৈতিক চরিত্র মাহাত্মের পূর্ণতা বিধানের অর্থ হৈ যে, নবী করিম (স) এর পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণ ও তাদের অনুসারীগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও বিভিন্ন দেশে নৈতিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিকের শিক্ষাকে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত করে তুলে ধরেন। কিন্তু রাসুলের পূর্ব পর্যন্ত এমন কোনো সর্বাত্মক ব্যক্তিত্ব ভূ-পৃষ্টে পরিদৃষ্ট হয় নাই যার দ্বারা ইসলামী নৈতিকতার সর্বাত্মক রূপ উপস্থাপিত ও বিবৃত হতে পারে এবং একদিকে নিজের জীবনে তা পালন করে দেখাতে ও অপরদিকে তদানুযায়ী একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাও গড়ে তুলতে পারে। বস্তুত এমন ব্যক্তিত্ব ইতিহাসে একবার মাত্র পরিদৃষ্ট হয় এবং তাহলো বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর তেইশ বৎসর নবুয়াতী জীবনে মানব জীবনের সমগ্র দিক ও ক্ষেত্রের জন্য নৈতিক চরিত্রের অপূর্ব ও উজ্জ্বল নিদর্শন সংস্থাপন করে গিয়েছেন।
আজ আমরা সেই চরিত্র হতে দূরে সরে গিয়ে দিন দিন ধ্বংসের দিকে পতিত হচ্ছি। তাই রাসূল (স) এর চরিত্র ও সকল আদর্শ ধারণ করে আমরা আমাদের জীবনকে আলোকিত ও উজ্জ্বল করে তুলব। (আমিন)

ওরিয়েন্টালিজম : একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ষড়যন্ত্র

উম্মে সালমা *

সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব পৃথিবীর চিরন্তন ইতিহাস। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে মিথ্যার উপর সত্যের বিজয় সতত অনিবার্য ছিল, আছে এবং থাকবে। যেমনঃ আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- "হে নবী আপনি বলুন সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত। নিঃসন্দেহে মিথ্যার বিনাশ অবধারিত।" আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দ্বীন আল-ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে মনোনীত করেছেন। নবী হযরত মুহাম্মদ (স) যার বাহক এবং যিনি স্বয়ং কুরআনের প্রতিবিম্ব। হাদীসের ভাষায় "তাঁর চরিত্র ছিল আল-কুরআন"।

রাসূল (স) এর নবুয়্যত প্রাপ্তির পর থেকে দীর্ঘ ২৩ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে একটি ইসলাম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তবে এ পথ ছিল কন্টকাকীর্ণ ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। প্রতিনিয়ত হাজারও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন নবীয়ে আকরাম (স) ও তাঁর আনীত ধর্ম ইসলাম। মক্কার মুশরিকরা হযরত মুহাম্মদ (স) ও তার সাহাবীদেরকে নানাভাবে অত্যাচার, নিপীড়ন ও নির্যাতন করেছে। মদীনার মুসলমানগণ কাফের মুশরিকদের সামরিক আক্রমণ ও ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। এভাবে ইসলাম তার সুদীর্ঘ যাত্রা পথে রোমান, পারস্য, বাইজেন্টাইন, তাতরীয়, ক্রুসেডীয় সামাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক সামরিক আগ্রাসন ও আক্রমনে জর্জরিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ইসলাম ও তার অনুসারীদেরকে এসব ষড়যন্ত্র ও আগ্রাসন থেকে পরিত্রাণ ও মুক্তি দিয়েছেন। ইসলামের শত্রু ইহুদী খৃষ্টান চক্র সামরিক আগ্রাসন ও আক্রমণে বিফল হয়ে বিশেষত মুসলিম বীর সেনাপতি সালাহুদীন আল আইয়ুবীর হাতে এক শতাব্দী কাল ব্যাপী ক্রুসেডীয় যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর একটি সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে। যা সামরিক আগ্রাসন থেকে অনেক শক্তিশালী ও অতি সুক্ষ প্রভাবশালী। যা মুসলমান জাতির কৃষ্টি, সভ্যতা-সংস্কৃতি, নৈতিকতা, চরিত্র ইত্যাদি এমনকি জাতীয় সত্ত্বাকেও অতিগোপনে ধীরে ধীরে সমূলে বিনষ্ট করে ফেলতে পারে। ফ্রান্সের রাজা লুইস যিনি ক্রুসেডীয় অষ্টম হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, মিশরীদের হাতে মনসুরা শহরে এক যুদ্ধে বন্দী হয়ে মোটা অংকের মুক্তিপণ দিয়ে ফ্রান্সে প্রত্যার্বনে পর বলেছিলেন "মুসলমানদের সাথে সামরিক যুদ্ধে বিজয় লাভ করা সম্ভব নয়"। কারণ তাদের ঈমান জিহাদ আত্মরক্ষা ও আত্মোৎসর্গের জন্য উৎসাহিত করে। তাই আমাদেরকে অন্য উপায় বের করতে হবে যা মুসলমানদের মন মস্তিষ্ক ও চিন্তার জগতে পরিবর্তন সাধন করবে। এ নতুন উপায় হলো Intellectual Aggression বা Intellectual War। এ অগ্রাসন বা যুদ্ধ বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় ও নানা পদ্ধতিতে আরম্ভ করেছে। মুসলমানদের কৃষ্টি, সভ্যতা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও আচরণ ইত্যাদি সবক্ষেত্রে এটি হানা দিতে চায়। এ উদ্দেশ্যে তারা পরিকল্পিতভাবে প্রচুর অর্থ সম্পদ ব্যায় করেছে। আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া, ইতালী, জার্মানী, ফ্রান্স, হাঙ্গেরী ও বেলজিয়াম সহ বিভিন্ন দেশের গবেষকগণ এতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন। যদিও তাদের মধ্যে কোন গবেষক হিংসা বিদ্বেষ ত্যাগ করে নিরপেক্ষভাবে সঠিক গবেষণা পদ্ধতি Scientific Methods অবলম্বন করে সত্য উৎঘাটনে সক্ষম হয়েছেন এবং ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। অতীব পরিতাপের বিষয় হলো বাংলাদেশ একটি বৃহৎ মুসলিম দেশ। কোটি কোটি মুসলমানের দেশ এবং হাজারো আলেম উলামার দেশ হওয়া সত্বেও এর মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তেমন কোনো গবেষণা হয়নি। উল্লেখযোগ্য কোনো বই পুস্তক রচিত হয়নি। এমন কি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসা সমূহের কারিকুলামে এ বিষয়ে তেমন কোনো স্থান নেই। অথচ আধুনিক যুগে Orientalism এর চ্যালেঞ্জই ইসলামী দাওয়াতের পথে বড় বাধা। এমন এক সময় ছিল যখন আলেম ওলামাগন গ্রীক দর্শন এ পারদর্শিতা অর্জন করে নাস্তিক দার্শনিকের মোকাবিলা করেছিলেন। তাই যুগের আহবানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের আলেম ওলামা, ইসলামী গবেষক, Orientalism নিয়ে গবেষণা ও পড়াশুনা করা অতীব জরুরী।

আরবি শব্দ ইসতিশরাক অর্থ প্রাচ্যের জীবন জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভাষা সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিদেশীদের জ্ঞান অর্জন। মুসতাশরিক বলতে বুঝায় যিনি প্রাচ্যের ভাষা, শিল্প ও সভ্যতা নিয়ে পড়াশোনা করেন। অতএব Orientalism এর আভিধানিক অর্থ

* গ্রেজুয়েট, সাইন্সেস অব হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

হচ্ছে প্রাচ্য সংক্রান্ত যে কোনো বিষয় নিয়ে গবেষণা করা, পড়াশুনা করা উক্ত বিষয় ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি, সভ্যতা, চরিত্র, নৈতিকতা, রাজনীতি, অর্থনীতি যাই হোক না কেন।

ওরিয়েন্টালিজম এর উৎপত্তি :

ওরিয়েন্টালিজম সর্বপ্রথম কখন কোথায় আরম্ভ হয়েছে তা নির্ধারণ করা অনেক কঠিন। কারণ তা প্রথমে পরিকল্পিত বা সংগঠিত ছিল না। বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ আগ্রহ ও কৌতুহলে ব্যক্তিগতভাবে প্রাচ্য বা ইসলামকে জানার চেষ্টা করেছেন, বিশেষত ক্রুসেডীয় যুদ্ধে মুসলামানদের কাছে পশ্চিমাদের পরাজয়ের পর।

Orientalism বা প্রাচ্যবাদের সূচনা ও প্রারম্ভ সম্পর্কে গবেষকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তা নিম্নে প্রদত্ত হলো

(ক) খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ট শতাব্দীতে প্রাচ্যবাদের গোড়া পত্তন হয়।

(খ) ইসলামের প্রথম যুগেই প্রাচ্যবাদের সূচনা হয়েছে যখন সাহাবাদের একটি দল আল্লাহর রসূলের নির্দেশে আবিসিয়া হিজরত করেছিলেন।

(গ) সপ্তম শতাব্দীতে বনি উমাইয়ার শাসনামলে প্রাচ্যবাদ আরম্ভ হয়েছে।

(ঘ) খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে স্পেন থেকে প্রাচ্যবাদের সূচনা হয়।

(ঙ) খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বহু ইউরোপীয় খৃষ্টান ছাত্র স্পেনের মুসলিম বিশ্ব বিদ্যালয়সমূহে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য সরকারীভাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাদের অনেকেই রোমের পোপ নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাই তখন থেকে প্রাচ্যবাদের আরম্ভ হয়।

(চ) খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাচ্যবাদের সূচনা হয়।

(ছ) প্রাচ্যবাদ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছে।

(জ) খৃষ্টীয় চতুদর্শ শতাব্দীতে প্রাচ্যবাদের সূচনা হয়েছে।

(ঞ) খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে Orientalism এর থেকে উৎপত্তি হয়।

ওরিয়েন্টালিজম এর ক্রমবিকাশ :

ক) প্রথম পর্যায় ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অভিভূত হয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার যুগ। অধিকাংশ গবেষক এ মত পোষণ করেছেন যে, ইউরোপে ইসলামের বিজয়ের পর থেকেই প্রাচ্যবাদের সূচনা হয়।

খ) ২য় পর্যায় ক্রুসেডের যুদ্ধ পরবর্তী যুগ। খৃষ্টান ইউরোপ এক শতাব্দী ব্যাপী ক্রুসেডের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে শোচনীয় পরাজয়ের পর তাদেরকে পরাহত করার জন্য বিকল্প ব্যবস্থায় চিন্তা ভাবনা শুরু করেন।

গ) সক্রিয় ও সুসংগঠিত প্রাচ্য বাদের যুগ : খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিমা উপনিবেশ বাদীরা মুসলিম দেশসমূহ একে একে আগ্রাসন করে।

ঘ) ৪র্থ পর্যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী যুগ। এযুগ বর্তমান সময় পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এ পর্যায়ে Orientalism আরও ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পৃথক Department খোলা হয়েছে। বিদেশী দূতাবাস সমূহে কনস্যুলেট অফিস খোলা হয়েছে।

প্রাচ্যবাদের কারণসমূহ :

১) ধর্মীয় কারণ : তারা আরবি ভাষা ও সাহিত্য এবং ইসলামী জ্ঞানার্জন করে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা চালিয়েছে। তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের অপব্যাখ্যা করা। ইসলামকে বিকৃতরূপে উপস্থাপন করা এবং ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে নানা অপবাদ প্রকাশ করা।

২) ঔপনিবেশিক কারণ : ক্রুসেডের যুদ্ধে পশ্চিমাদের শোচনীয় পরাজয় সত্ত্বেও তারা মুসলিম ও আরব দেশসমূহে পুণরায় আগ্রাসন করা থেকে নিরাশ হয়নি। তাই তারা দেশ সংক্রান্ত গবেষণায় মনোনিবেশ করেন।

৩) অর্থনৈতিক কারণ : মুসলিশ দেশসমূহের ধন-সম্পদ লু ণ্ঠন করা। প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাস-তেলসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদ দখল করা, ইত্যাদি মুসলিম দেশসমূহকে তাদের উৎপদিত পণ্যের বাজারে পরিণত করা এবং মুসলিম দেশসমূহের নিজ শিল্প ও উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া।

৪) কুটনৈতিক কারণ : স্থানীয় আলেম-ওলামা ও জনগনের প্রতিরোধ ও সংগ্রামে নিরুপায় হয়ে পশ্চিমারা তাদের ঔপনিবেশ

ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে তারা ওরিয়েন্টালিজমকে তাদের কুটনৈতিক চালের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

৫) একাডেমিক কারণ : প্রাচ্যবাদের একটি একাডেমিক কারণও রয়েছে। তারা বিভিন্ন জাতির ভাষা সাহিত্য, সাংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সভ্যতাকে জানার জন্যই অধ্যয়ন ও গবেষণা করেছেন।

প্রাচ্যবাদের পদ্ধতি ও পন্থা :

১) বই পুস্তক রচনা : ইসলামের নানা বিষয় যেমন : কুরআন, সুন্নাহ, রিসালাত, শরীয়াহ, সংস্কৃতি, সভ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রাচ্যবিদগন অসংখ্য বই পুস্তক রচনা করেছেন।

২) ম্যাগাজিন বা সাময়িকী প্রকাশ।

৩) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও একাডেমীতে নানান বিষয়ে লেকচার প্রদান।

৪) মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন একাডেমীতে সদস্যপদ গ্রহণ।

৫) আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন

৬) ইসলামী বিশ্বকোষ রচনা ও প্রকাশ করা।

প্রাচ্যবাদের ক্ষেত্রসমূহ :

১) আল কুরআনুল করীম

২) হাদিস শরীফ

৩) আল ফিক্‌হ আল ইসলামী বা ইসলামী আইন

৪) আরবী ভাষা ও সাহিত্য

৫) ইসলামী রেনেঁসা

প্রাচ্যবাদের নেতিবাচক প্রভাব

১) আকিদাহগত প্রভাব : তাওহীদ,রিসালাত, আখিরাতসহ ইসলামের মৌলিক আকীদাহ নষ্ট করার জন্য প্রাচ্যবাদ নানাভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে।

২) সামাজিক প্রভাব : মুসলিম বিশ্বে প্রাচ্যবাদের সামাজিক প্রভাব হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুতর ও ভয়ংকর। তারা সমাজে প্রগতিশীলতা, নারী স্বাধীনতা, নারী অধিকার, নারী শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন ও পল্লী উন্নয়ন ইত্যাদি শ্লোগান তুলে সামাজিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করার চেষ্টা করছে।

৩) রাজনৈতিক প্রভাব : পশ্চিমরা মনে করেন পাশ্চত্য গণতন্ত্রই সবোৎকৃষ্ট রুপ। প্রাচ্যবিদগণ ইসলামী রাষ্ট্রনীতি, ইসলামী খেলাফত পদ্ধতি, খোলাফায়ে রাশেদীন এর শাসন ব্যবস্থা এবং হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমরের (রা) খেলাফত গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো যখনই তাদের প্রবর্তিত গণতন্ত্রের মাধ্যমে কোন ইসলামী দল ক্ষমতায় এসে যায় তখন সামরিক জান্তাদের সহযোগিতা করে ইসলাম পন্থীদেরকে দমনের জন্য, যেন তারা ক্ষমতায় আসতে না পারেন। এটাই পাশ্চত্য গণতন্ত্রের আসল চেহারা।

অর্থনৈতিক প্রভাব : বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী অর্থনীতির পরিবর্তে পাশ্চত্য পুজিঁবাদী অর্থনীতি বা সমাজবাদী অর্থনীতি চালু করার পিছনে প্রাচ্যবাদের ভূমিকা অন্যতম।

প্রাচ্যবিদদের শ্রেণী বিন্যাস : আমরা প্রাচ্যবিদদেরকে তিন শ্রেনীতে বিন্যাস করতে পারি।

১ম : যারা হিংসা-বিদ্বেষ এর বশীভূত হয়ে সঠিক গবেষণা পদ্ধতি পরিহার করে ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে লিখেছেন। তাদের মধ্যে Henry Iammaens, Zweimer ও Gold Ziher. অন্যতম।

২য়: যারা নিরপেক্ষভাবে জ্ঞানার্জনের স্বার্থে ও স্বীয় জাতির উপকারার্থে ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করেছেন এবং লিখেছেন। তারা ইসলামরে প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি। তাদের মধ্যে Kunt Henry Icastero, Carlyle ও Tolestoy এর নাম প্রসিদ্ধ।

৩য় : যারা নিরপেক্ষভাবে জ্ঞানার্জনের স্বার্থে ও স্বীয় জাতির উপকারর্থে ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করেছেন এবং লিখেছেন গভীরভাবে ইসলামকে অধ্যয়ন করেছেন। পরিশেষে ইসলামের সভ্যতা উপলব্দি করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন ও ইসলামের স্বপক্ষে লিখেছেন। অন্যান্য প্রাচ্যবিদগনের ভ্রান্ত মতবাদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন ও ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত রেখেছেন। তাদের মধ্যে Lord Hedleoy ও Atiuan Dene উল্লেখযোগ্য।

প্রতিকার নয় প্রতিরোধে সচেতনতাই কাম্য

তানজিফা ইসলাম নাহিদা

প্রবাদ আছে- সাবধানতা চিকিৎসার চেয়ে উত্তম।
Prevention is better than cure
অর্থাৎ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই শ্রেয়।
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শরীরকে নিরোগ রাখার জন্য শরীরের যত্ন সম্পর্কে সজাগ থাকা একান্ত প্রয়োজন।
"সুস্থ দেহ-ই সুস্থ মনের অধিকারী" কথাটি বিশ্বজুড়ে মানুষের কাছে স্বীকৃত। সুন্দর সুস্থ জীবন যাপনের জন্য প্রতিযোগিতার প্রয়োজন হয় না। এটা মানব জীবনের স্বাভাবিক দাবী। শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য বেশি খেয়ে মোটা হওয়ার প্রয়োজন নেই। যারা বেশ মুটিয়ে ওজনদার হয়ে উঠেছে, তাদের জন্য ইংরেজীতে চমৎকার কথা রয়েছে।
There is nothing healthy about being over weight
এই পৃথিবীতে চিকন মানুষ যেমন আছে, তেমনি আছে মোটা মানুষ এবং মোটাদের রয়েছে হাজারো সমস্যা।
দেখি আমরা, আসলে সুস্থতা কি?
১। বলা যায়, স্বাস্থ্যই সম্পদ। ভালো স্বাস্থ্য সুখের নিশ্চয়তা দিতে পারে। একজন স্বাস্থ্যবান মানুষ রুগ্ন ধনী ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর সুখী। একজন স্বাস্থ্যবান মানুষ তার পরিবারের নিকট সম্পদ। পক্ষান্তরে একজন রুগ্ন ব্যক্তি সকলের নিকট বোঝা স্বরূপ।
(Health is wealth a good health is a guarantee for happiness. A healthy poor man is more happy than a sick moneyed man. A Healthy man is an asset to his family. On the other hand a sick man hand is liability to all.)
২। স্বাস্থ্য মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ।
(Health is the greatest wealths of a man)
৩। স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল।
(Health is the root of all happiness)
৫। কেবল একজন স্বাস্থ্যবান লোকই সুখী হতে পারে।
(Only a helthy man can be happy)
৬। একজন অসুস্থ্য ধনী লোক একজন দরিদ্র স্বাস্থ্যবান লোকের মত সুখী নয়।
(A sick-moneyed man is not as happy as a poor helath man)
বিশেষ কয়েকটা উপায় অবলম্বন করলে মেদহীন সুঠাম ও সুস্থ্য দেহের অধিকারী হওয়া যায়। আর তা হলো-
১। মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন
২। খাবার গ্রহণে ভারসাম্যতা রক্ষা
৩। নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাস

মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন :
শরীর সুস্থ্যতার জন্য আত্মবিশ্বাসী হওয়া অত্যাবশ্যক।
প্রতিজ্ঞা করে অধ্যাবসায়ে নামতে হবে। যে রকম ধীরে ধীরে মেদ জমেছে সে রকম ধীরে ধীরে সারবে। আগামীকাল নিশ্চয় ভালো হবে সব সময় এই দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে।

খাদ্য গ্রহণে ভারসাম্যতা :
মোটা হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ব্যক্তি পর্যায়ে অতিরিক্ত ক্যালরি গ্রহণ কিন্তু পর্যাপ্ত কায়িক পরিশ্রম না করাকে মোটা হওয়ার

* ৫ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী, সাইন্সেস অব হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে আছে খাদ্য গ্রহণ ও শারীরিক শক্তি খরচের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব। ভারসাম্য বজায় রাখা যায় দু'ভাবে-

১। শারীরিক শ্রম বাড়িয়ে দেওয়া।

২। শ্রমের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে খাবার খাওয়া।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, সপ্তাহে অন্তত ১৫০-২৫০ মিনিট দ্রত হাঁটা বা সাঁতার কাটার অভ্যাস করতে হবে। কম ক্যালোরি ও পুষ্টিসমৃদ্ধ ফল, সবজি ও গোটা শস্য দানা গ্রহণ করতে হবে। ৪০ বৎসর অতিক্রম করলে পুরুষ মহিলা উভয়কেই শতকরা ৭ ভাগ করে বেশি ক্যালোরিযুক্ত খাবার খাওয়া কমিয়ে দিতে হবে। এভাবে প্রতি দশ বৎসরে ৭ ভাগ করে কমাতে হবো।

স্বাভাবিকভাবে একজন পুরুষ অথবা মহিলার প্রতিদিন ১৮০০ থেকে ২৮০০ ক্যালোরি শক্তির দরকার হয়। তাই খ্যাদ্য নিয়ন্ত্রণের শুরুতেই প্রতিদিনের ক্যালোরির পরিমান কমিয়ে আনতে হবে।

বেশী খাওয়ার অভ্যাস কমাতে হবে। একজন পুরুষ বা মহিলা যদি স্বাভাবিক ক্যালরি থেকে প্রতিদিন ৫০০ ক্যালরি কম খাদ্য গ্রহণ করে তবে তার সপ্তাহে প্রায় ১ পাউন্ড ওজন কমে যাবে।

নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাস ঃ নিয়মিত ব্যায়াম শুধু ওজন কমিয়ে শরীরের গঠন ঠিক রাখে তা নয়, শরীরের আভ্যন্তরীন সুস্থতাও ঠিক রাখে। ব্যায়াম না করার ফলে শরীরের মেদ বৃদ্ধি পায়। ব্যায়ামই শরীরের নিয়ন্ত্রন সাধনের অন্যতম মাধ্যম।

দৈনন্দিন জীবন যাপনের কিছু কাজও ব্যায়ামের অন্তর্ভূক্ত যেমন :

১। উপুড় হয়ে শুয়ে হাত ও পা পিছন দিকে উপরে তোলা, এতে পেটে চাপ পড়ার ফলে মেদ কমে যাবে।

২। ঘর মোছা, কাপড় ধোয়া, বসে তরকারী কাটা ও রান্না করা ইত্যাদি কাজে পেট কমে যায়।

৩। প্রতিদিন ৪০-৫০ মিঃ দ্রুত হাটলে ওজন কমে যাবে।

৪। জগিং বা স্কিপিং করলে শরীর সতেজ ও হালকা বোধ হয় এবং মেদ কমে যায়।

৫। দুটো হাত মাথার উপরে তুলে একবার বাম পায়ের কাছে নিন এবং আরেকবার ডান পায়ের কাছে নিন। এভাবে ১০-১৫ বার করলে শরীরে দু'পাশের মেদ কমে যায়।

শিক্ষার্থীদের জন্য শারিরীক সুস্থতা আবশ্যক। তাই একজন শিক্ষার্থীকে অবশ্যই তার স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হতে হবে। কারণ একটি সুন্দর মন সুন্দর সুস্থ দেহে বিরাজমান থাকে। ভালো স্বাস্থ্য বা সুস্বাস্থ্য সফলতার চাবিকাঠি। ভালো স্বাস্থ্য উপভোগ করতে হলে একজন শিক্ষার্থীকে আবশ্যই স্বাস্থ্যের নিয়মাবলি মেনে চলতে হবে। একজন স্বাস্থ্যহীন লোক অঢেল বিত্তের অধিকারী হতে পারে কিন্তু সে অসুখী জীবন যাপন করে।

সুতরাং বলতে পারি যদি আমরা উল্লেখিত উপায়গুলো প্রয়োগ করে রোগ প্রতিরোধে সচেতনাতবোধ বৃদ্ধি করি তাহলে সুন্দর ও সুস্থ্য শরীর পেতে পারি। বিশেষ করে নিয়মিত শরীর চর্চায় আমাদের অভ্যস্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আখলাকই শ্রেষ্ঠ সম্পদ

ফাহিমা জান্নাত

আখলাক বলতে মার্জিত, নির্মল, সুন্দর চরিত্র ও সদাচারকে বুঝায়। মানুষের আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা, মানসিকতা, কাজ করার নীতি পদ্ধতি সবকিছু আখলাকের অন্তর্ভূক্ত। আখলাকই মানব জীবনের প্রধান ভূষণ। আখলাক তথা চরিত্র গঠন ছাড়া কোনো জাতি শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নতি লাভ করতে পারে না। আখলাক মানুষকে ন্যায়, সত্য, সংযম ও শ্রদ্ধাবোধ শিক্ষা দেয় এবং সৎপথে চলার অনুপ্রেরণা যোগায়। যে যতবেশী সৎ চরিত্রের অধিকারী হয়েছে সে ততবেশী সাফল্যমন্ডিত হয়েছে। আর এর শীর্ষস্থানে রয়েছেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন : وانك لعلى خلق عظيم
অবশ্যই আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত। (সূরা আল-কলম:৪)।
কবি হাফিজ ইবরাহীম বলেছেন :
আখলাক হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ "মানবজীবনের সম্পদ তিনটি : ধন, বিদ্যা ও উত্তম চরিত্র। ধনকে যদি তুমি জ্ঞান দ্বারা উত্তমরূপে সংরক্ষণ না কর তবে তা হবে দারিদ্রতার বহিঃপ্রকাশ। আর জ্ঞানকে যদি চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা পরিবেষ্টন করা না হয় তবে তা হবে ব্যর্থতার বাহন। জ্ঞানের সাধনা যতক্ষণ না উন্নত চরিত্রে ভূষিত হবে, ততক্ষণ জ্ঞান তার কল্যাণ দান করবে না। তাই বুঝা যায়, মানুষের সর্বোত্তম অলংকার হচ্ছে চরিত্র। বলা হয়ে থাকে :

Money is lost nothing is lost, health is lost something is lost is but character is lost everything, lost.

* চরিত্রবান ব্যক্তিগণ সর্বদা এই সম্মান পেয়ে থাকে। আর আখলাক বিহীন ব্যক্তি গন্ধহীন ফুলের ন্যায়। সে মানুষের মর্যাদা হারিয়ে পশুত্বের পর্যায়ে নেমে আসে। রাসূল (স) বলেছেন :

خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سمت ولا فقه في الدين

'দু'টি স্বভাব মুনাফিকের মধ্যে একত্রিত হয় না। একটি হলো সুন্দর চরিত্র অপরটি দীনের সুষ্ঠু জ্ঞান'। (তিরমিযী)
* মানুষের দৈহিক সৌন্দর্য অপেক্ষা তার সুন্দর স্বভাবের গুরুত্ব অনেক বেশি। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, আভিজাত্য, উন্নতি, যশ ও খ্যাতির মাপকাঠি তার চরিত্র। ধন জন ও ঐশ্বর্য্য মানুষকে শ্রৈষ্ঠত্বে অধিষ্ঠিত করতে পারে না। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয় তার চরিত্রে। রাসূল (সা) বলেছেন :

إن من أخيركم أحسنكم خلقا

'তোমাদের মধ্যে যার স্বভাব চরিত্র ভালো সে সবচেয়ে উত্তম' (বুখারী)। চরিত্রগুনে গুনান্বিত হয়ে ইহকালীন শান্তি ও রাসূলের ভালোবাসা অর্জন করে খাঁটি মুমিনের পূর্ণতা লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন :

أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا

'চরিত্রের বিচারে যে উত্তম মুমিনের মধ্যে সে পূর্ণ ঈমানের অধিকরী'।
* একজন মানুষ চরিত্রবান হতে হলে তাকে রাসূল (স) কে মডেল হিসেবে ধরে নিয়ে তাঁর পথ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। কেননা রাসূল (স) এর আদর্শই আমাদের পাথেয়। তিনি হচ্ছেন أسوة حسنة তথা সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং তার জীবনই হলো বাস্তব কুরআন।

---

* ৫ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী, সাইন্সেস অব হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

একটি অতুলনীয় সবর

মো : রাকিবুল ইসলাম

হযরত আনাস ইবনে মালিক (র) হতে বর্ণিত নবী করীম (স) বলেছেন স্বপ্নে আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। হঠাৎ কারো নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি ফেরেশতাদেকে জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে? তাঁরা বললেন ইনি হলেন রুমাইছা বিনতে মিলহান, আনাস ইবনে মালেকের আম্মা। হযরত জাবের (র) হতে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম জান্নাতে প্রবেশ করছি। হঠাৎ দেখি আমার সামনে আবু তালহার স্ত্রী রুমাইছা। হযরত রুমাইছা বিনতে মিলহান আনসারিয়া (রা) এর উপনাম হল উম্মে সুলাইম। এ নামেই তিনি অধিক প্রসিদ্ধ। ইসলাম গ্রহনে অগ্রগামী সাহাবীদের মধ্যে তিনিও একজন। প্রথমে মালেক ইবনে নযরের সাথে তার বিবাহ হয়। সেই ঘরেই আনাস (রা) এর জন্ম। তার ইসলাম গ্রহণে ক্রুদ্ধ হয়ে স্বামী মালেক ইবনে নযর দেশত্যাগ করে সিরিয়ায় চলে যায় এবং সেখানেই মৃত্যু বরণ করে। পরে তিনি হযরত আবু তালহা (রা) এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। পরবর্তীতে যখন আনাস (রা) এর ১০ বছর হয় তখন তাকে তার মা রাসূল (স) এর খেদমত করার জন্য নিয়ে আসেন। তখন থেকেই আনাস (রা) নিয়মিত রাসূল (স) এর খেদমত করছেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, হে প্রভু আমার আম্মাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তিনি আমাকে উত্তম ভাবে লালন পালন করেছেন। হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন নবী করীম (স) উম্মে সুলাইম ও কিছু আনসারি মহিলাকে যুদ্ধে নিয়ে যেতেন যুদ্ধাহতদের সেবা শুশ্রুষা ও পানি পান করাতে। হুনাইনের যুদ্ধে তিনি তরবারী হাতে রনাঙ্গনের দিকে এগিয়ে গেলেন। আবু তালহা (রা) বলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে উম্মে সুলাইম। তাঁর হাতে তরবারী। উম্মে সুলাইম বলেন, কোনো মুশরিক আমার নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করলে আমি এটা দিয়ে তার নাড়িভুড়ি বের করে ফেলব। তাঁর সাহসীকতা, বীরত্ব, বুদ্ধিমত্তার অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি যে মুসিবতের সময় ধৈর্য্যশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া কঠিন। ইমাম বুখারী (রা) তার বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সহীহ বুখারীতে তার এই ঘটনার শিরোনাম করেছেন এভাবে 'মুসিবতের সময় যিনি তার মর্মবেদনা প্রকাশ করেন না।' ঘটনাটি হল, হযরত আবু তালহার সাথে উম্মে সুলাইমের বিবাহ হওয়ার পর তাদের খুব সুন্দর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হয় উমাইর। তার একটি পাখি ছিল যার সাথে সে খেলাধুলা করতো। নবী করীম (স) মাঝে মধ্যে তার সাথে কৌতুক করে বলতেন হে উমাইর! তোমার বুলবুলির কি খবর। আবু তালহা তাকে অনেক ভাবাসতেন। একদিন ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। আবু তালহা খুব চিন্তিত এবং অস্থির হয়ে পড়লেন। এক বিকালে তিনি ঘর থেকে বের হলেন ইতিমধ্যে তার অসুস্থ ছেলে মৃত্যুবরণ করল। উম্মে সুলাইম মৃত্যুর পর ছেলেকে গোসল দিলেন, কাফন পড়ালেন ও সুগন্ধি মেখে দিলেন। তার পর ঘরের এক কোনে সুন্দর করে শুইয়ে রাখলেন। হযরত আনাস কে পাঠিয়ে হযরত আবু তালহাকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে বলে দিলেন যেন তাকে মৃত্যু সংবাদ না জানায়।

আবু তালহা সেই দিন রোযা রেখেছিলেন। তার স্ত্রী তার জন্য খাবার তৈরী করলেন। তিনি ঘরে ফিরেই সন্তানের কথা জিজ্ঞেস করলেন। উম্মে সুলাইম বলেন, সে এখন আগের চেয়ে শান্ত। ক্লান্ত স্বামীকে তৎক্ষনাৎ পুত্রের মৃত্যুসংবাদ জানালেন না। ঘরের লোকদেরকেও নিষেধ করে রেখেছিলেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ যেন এ সংবাদ তাকে না জানায়। আবু তালহা নিশ্চন্ত মনে রাতের খাবার খেলেন এবং বিশ্রাম নিলেন এমনকি ভোরে গোসলও করলেন।

হযরত আবু তালহা (রা) সকালে বের হওয়ার আগে উম্মে সুলাইম তাকে বললেন, বলুন কেউ যদি কারো কাছে কোনো কিছু গচ্ছিত রাখে অতঃপর তার কাছ থেকে ফেরত চায় তার কি অধিকার আছে তা ফেরত না দিয়ে নিজের কাছে আটকে রাখার? তিনি বলেন, না তার এ অধিকার নেই। এবার উম্মে সুলাইম শান্ত কণ্ঠে বলেন আপনার পুত্রের ব্যাপারে সবর করুন। আল্লাহ তায়ালা তাকে গচ্ছিত রেখেছিলেন তারপর ফিরিয়ে নিয়েছেন। আবু তালহা এতে রাগান্বিত হলেন এবং রাতের আচরনে অসন্তুষ্ট হয়ে রাসূল (স) এর নিকট স্ত্রীর নামে অভিযোগ করলেন। রাসূল (স) এই ঘটনা শুনে বিমুগ্ধ হলেন এবং দু'আ করে বললেন, আল্লাহ তোমাদের এ রাতে বরকত দান করুন। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে আব্দুল্লাহ নামে আরেকটি সন্তান দিলেন এবং পরবর্তীতে তার ঘরে সাতজন সন্তান দিলেন যারা প্রত্যেকে আলেম হয়েছেন। উম্মে সুলাইম কেমন সবর করেছেন স্বামীকে পুত্রের মৃত্যু সংবাদ না জানিয়ে তাকে নিশ্চিন্তে রাত্রি যাপনের সুযোগ দিয়েছেন এবং সন্তানের মৃত্যু গচ্ছিত বস্তুর ফেরৎ নেয়ার সাথে তুলনা দিয়ে শোকার্ত স্বামীকে যেমন সান্তনা দিয়েছেন তেমনি আল্লাহর ফয়সালাকে মেনে নিয়েছেন।

* ১ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী, সাইন্সেস অব হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

মরিচীকা

মু. আবদুল গাফ্ফার হামীম *

হঠাৎ করেই যে ছেলেটা নতুন করে দ্বীনের ছোঁয়ায় উজ্জীবিত হতে চায় তাকে একসাথে অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হয়। যেমন: লাইফ স্টাইল, ফ্রেন্ড সার্কেল। কিন্তু দ্বীনের পথে শক্তভাবে টিকে থাকা একটু কঠিন বটে। অনেক ক্ষেত্রেই পা পিছলে যাওয়ার মতো চ্যালেঞ্জ তৈরী হয়ে যায়। এমনকি যাকে সে পছন্দ করে তাকে দ্বীনের পথে আনতে গিয়ে নিজেই শয়তানের ফাঁদে পড়ে বেদ্বীন হয়ে বসে আছে। কেননা মানুষ তার অতীতের প্রতি দুর্বল। বিশেষ করে সে অতীত যদি বার বার চোখের সামনে এসে ধরা দেয় তাহলে তো অবস্থা আরো ভয়াবহ হয়। এমনও হয় কিছুদিন পর সে ভুলে যায় কুরআনের সেই আয়াতের কথা। যেখানে বলা হয়েছে

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

অর্থাৎ মুমিনদেরকে বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং যৌনাঙ্গ হেফাজত করে।
শয়তান পুরোনো দিনের সেই কথা গুলো অনেক সুন্দর করে তার সামনে উপস্থাপন করে এবং চেষ্টা করে পুনরায় প্রেমের ফাঁদে আটকে ফেলার। আর কোনো সন্দেহ ছাড়াই বলা যায় মূলত এমনটা হয় অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালবাসার অভাবে।
ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা (র) বলেন, যদি কোনো হৃদয় আল্লাহকে ভালবাসে এবং তার প্রেমেই নিজেকে নিবেদিত করে তবে সে অন্য কারো প্রেমের কথা চিন্তাও করতে পারে না। যেমনি ভাবে হযরত ইউসুফ (আ) আল্লাহর প্রেমে নিবেদিত ছিলেন বলেই অন্য কারো প্রেম তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين

অর্থাৎ এমনিভাবে আমি তার থেকে অনিষ্ট ও অশ্লীলতা দূর করে দেই। নিশ্চয় সে আমার বিশুদ্ধ মনের বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত।
আবার কখনো সেই মেয়েটার ব্যাপারে মনে কৌতুহল সৃষ্টি হলে অধিকাংশ সময় সে হতাশ হয়ে পড়ে। লুকিয়ে হয়তো তার প্রোফাইলে ঢুকে অথবা পুরোনো ছবি দেখে আর অনুশোচনার সাগরে ডুবে যায়। তার পক্ষে দুনিয়ার সব মেয়ের কাছ থেকে বেঁচে থাকলেও ওই মেয়ের কাছে থেকে নিজেকে রক্ষা করা কষ্টকর হয়ে পড়ে।
আবার এমনও হয় কখনো এসব কিছু না করেও হঠাৎ শুধু একদিনের এক পলক দেখাতেই দ্বীনের জযবা চূরমার হয়ে যায়। সেই বালক সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয় এবং নিজেকে গুনাহগার মনে করে। এদেরকে সান্তনা দিয়ে ইবনুল কায়্যিম (রা) বলেন, যদি ভালোবাসা এমন কারণে হয় যেটা হারাম নয় তাহলে তার কোনো দোষ হবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছে থেকে আলাদা হয়ে গেছে কিন্তু ভালোবাসাটা মনে রয়েই গেছে। তাতে কোনো পাপ নেই। একইভাবে কোনো ব্যক্তির যদি হঠাৎ বেগানা কারো প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায় আর সে তার দৃষ্টি সরিয়ে ফেলে তবু অনিচ্ছা স্বত্তেও হৃদয়ে ভালোবাসা জন্ম নেয়। তাহলে সে অবশ্যই তার অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
মনের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধের কথা কেউ না জানলে ও আল্লাহু সুবহানাহু তায়ালা ঠিকই জানেন। তাই তিনি এ জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থাও রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়ে বলেন,

إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين

অর্থাৎ যে ব্যাক্তি আল্লাহকে ভয় করে এবং ধৈর্য্য ধারন করে অবশ্যই আল্লাহ এমন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।
পরিশেষে বলতে চাই যে সকল ভাইয়েরা এমন অনেক কিছু ত্যাগ করেছেন মহান আল্লাহ তায়ালা যেন তাদের ত্যাগসমূহ কবুল করে নেন। অন্তরের কষ্ট গুলো দূর করে দেন। তাদের জন্য দুনিয়াতে উত্তম জীবন সঙ্গিনী এবং আখেরাতে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন। রাসূলল্লাহ (স) বলেছেন। আল্লাহর জন্য তুমি কিছু ত্যাগ করবে আর আল্লাহ তোমাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু প্রতিদান হিসেবে দিবেন না এমনটা কখনোই হবে না।

* ১ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী, সাইন্সেস অব হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

এতকিছুর পরেও যদি কারো মন ভালোবাসার কথা বলে হারামের দিকে ছুটে যেতে চায় তাদের উদ্দেশ্য কবিতার চরণ দু'টি উপস্থাপন করলাম । যাতে তারা মনকে কিছুটা হলেও শান্ত রাখতে পারে।

كذلك الحب لا إتيان معصية
لا خير في لدة من بعدها سقر

অর্থাৎ সেটা ভালোবাসা নয়
যা ভাসিয়ে নিয়ে যায় গুনাহের সাগরে।
কী লাভ সেই প্রেম?
যার জন্য ঠিকানা হয় আগুনে।

বিশ্বাসের গুরুত্ব

শাহরিন সুলতানা

বিশ্বাস কী? এটা কি চোখে দেখা যায়? হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়? নাকি কোনো কিছুতে আবদ্ধ করা যায়? প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস হচ্ছে এক অদৃশ্য অনুভূতি, এক সীমাহীন সীমানা এক অস্তিত্বহীন সত্য, এক অতৃপ্ত ভালোলাগা। আর এই বিশ্বাসেই নিহিত আছে প্রশান্তি, এই বিশ্বাসেই আছে মুক্তি। এই বিশ্বাসের আছে অনেক রূপ। সকল রূপেই এটির সমান গুরুত্ব রয়েছে। ধর্মে এই বিশ্বাসের নাম ঈমান, যার উপস্থিতি মানুষকে স্বগীয় করে তোলে। পরিবারে এই বিশ্বাসের নাম ভরসা। যা সকল প্রকার সন্দেহের অবকাশ দিয়ে নিশ্চিন্তে বসবাস করার প্রতিশ্রুতি দেয়। সমাজে এই বিশ্বাসের নাম নিরাপত্তা, যা ব্যক্তির চলার পথকে অনেক সহজতর করে দেয়। ব্যক্তি জীবনে এই বিশ্বাসের নাম আত্মবিশ্বাস, যা মানুষকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দেয়। সম্পর্কে এই বিশ্বাসের নাম প্রাণ, যার অনুপস্থিতি সম্পর্কের মৃত্যু ঘটায়। এই বিশ্বাসের অবতারণা হয় মন থেকে। যে মন বিশ্বাস করতে জানেনা সে মনে কোনো তৃপ্তি নেই। কোনো পাওয়া নেই, কোনো আশা নেই, কোনো ভালোবাসা নেই, আছে শুধু সন্দেহ, সংশয় আর একাকীত্বতা। ব্যক্তি আর বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে এক অদ্ভুত সম্পর্ক। যে বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয় সে অবিশ্বাসী। যে বিশ্বাসের যথাযথ ভাব বুঝতে পারে না সে অন্ধবিশ্বাসী। আর যে বিশ্বাসের অবমূল্যায়ণ করে সে বিশ্বাসঘাতক। প্রকৃতপক্ষে যার নিজের উপর ভরসা নেই। সে অন্যকেও বিশ্বাস করতে জানে না। সে সব কিছুর অস্থিত্ব খুঁজে পেতে চায়। এই বিশ্বাসই মানুষকে বিশ্বাসভাজন করে। তাই কখনোই এর অস্তিত্ব খুঁজতে যাওয়া ঠিক নয়। শুধু এই বিশ্বাস থেকে অর্জিত শান্তি অনুভব করতে হয়।

* ৮ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী, সাইন্সেস অব হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

গল্প

আহ্বান

রুবাইয়া মাহমুদ

সূর্য অস্ত যেতে আরো কিছুক্ষণ বাকি। কফির মগ হাতে অস্থিরভাবে ছাদে পায়চারি করছে রুহামা। ভাঙ্গা গড়ার খেলা। দেখানো সম্পর্কের সুতোটা একটানে ছিঁড়ে ফেলতে পারলে হয়তো খানিকটা শান্তি মিলবে। রাগে কপালের শিরা দপদপ করছে। মগটা ছুড়েই মারলো। মগটা চূর্ণ বিচূর্ণ। ভাঙ্গা কাচগুলোর মতো মনে হতে থাকে নিজেকে। অনৈতিক কাজে শান্তির আশা করে যে ভুলটা করতে যাচ্ছিলো তা তার মনটাকে দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছে। কত সহজেই এসব সম্পর্ক ভাঙতে পারে তার ফল হাঁড়ে হাঁড়ে টের পাচ্ছে সে। বাবার মুখটা খুব মনে পড়ছে। বেশ কিছুদিন হলো বাড়ি যাওয়া হয় না। ফজর নামাজ শেষে বড় আপাসহ বাবার সাথে কুরআন তিলাওয়াত, হাতের মুঠোয় আঙ্গুল পুরে প্রাতঃভ্রমণ। আহা! সেই দিনগুলো কতদিন মিস করা হয় না। বিকেলে ঝালমুড়ির সাথে আসহাবে রাসূলের কাহিনী শুনা কতদিন যে মনে করে দেখা হয় না।

ইউনিভার্সিটি লাইফের তিন বছর হল। পরিবারের সবাইকে ছেড়ে একা থাকার বছরগুলো শুরুটা ঠিক ছিল। কিন্তু পরের একটা বছরে কত অদ্ভুতভাবেই না পরিবর্তন এসেছে। ছেলেটার সাথে ভার্সিটিতেই দেখা, কথা, মেলামেশা, লাগামহীন সম্পর্ক। একবারও মনে নাড়া দেয়নি কি করছে বা করতে যাচ্ছে? চিন্তার জগতটা অন্য কোথাও বন্ধক রেখেছিল। মরিচীকার পেছনে ছুটতে থাকা এই সময়টা তাকে অনেক পাল্টে দিয়েছে। স্রষ্টার প্রতি কর্তব্যে অবহেলা সাময়িক শান্তি দিলেও এখন ভুলের মাশুল দিতে হচ্ছে।

মাগরিবের আজান ভেসে আসছে, মরচে ধরা আলসে মন সাড়া দিতে চায় না। মাথা দু হাতে চেপে বসে পড়ে সে। পুরো শরীর বেয়ে শিহরণ আলো আধারের খেলায় অন্ধের মত হাতড়ে বেড়ায়। যষ্ঠি খুঁজে পায় না। কি হচ্ছে তার সাথে, কিছুই স্পষ্ট নয়। অদ্ভুত সময়টা থমকে আছে। রুহামার মনে হচ্ছে অস্তমিত সূর্যটাও ঘোর লাগা চোখ তাকে দেখছে। মনে হচ্ছে নিশ্চুপ প্রকৃতি তাকে খুব ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। কুয়াশার একটা আস্তরণ তার চোখ মুখ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কতক্ষণ এভাবে কেটেছে বুঝতে পারছে না সে। পাশে একটা মূর্তির ছায়া পড়ল। তার কাঁধে পরম মমতায় হাত রাখল। ধীরে ধীরে হাত ধরে তুলল। নাজিহা তার রুমমেট, তার পাল্টে যাওয়ার দিনগুলো খুব কাছে থেকেই দেখেছে। কিন্তু তাকে কিছু বলতনা নাজিহা রুহামা নিজেই বুঝতে পারে। এই সময়গুলোতে কেউ কিছু বললেও কানে উঠবে না। নিজের ভেতর থেকে যতক্ষণ অনুভবটা আসবে না কারো কোনো উপদেশও কাজে আসবে না। তাই হয়তো নাজিহাও কিছু বলত না। তার সিনিয়র হলেও বন্ধুর মতই সম্পর্ক দু'জনের। তাকে হাত ধরে ছাদের এক কোনায় নিয়ে গেলো। বলল বসো এখানে কি হয়েছে এবার বলতো। জমানো কথাগুলো নিরবে অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ছে। কথা খুঁজে পায়না রুহামা ঢোক গিলে ধীরে ধীরে বলে আবির বলেছে তার জীবনে আমাকে প্রয়োজন নেই। তুমিই বল আপু কি কিরিনি, আমি ওর জন্য ওর প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতাম। এমনকি সে চাইতো না বলে বাড়িতেও যেতাম না। মা বাবার চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলাম। সে মানুষটা এখন অন্য কারো সাথে ইনভলভড্। আর বলতে পারলো না রুহামা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে ওঠে। নাজিহা কিছুক্ষণ ভেবে মেয়েটাকে কাঁদার একটু সময় দিল। তারপর দু'হাতে মেয়াটার হাত দু'টো তুলে নিয়ে বলল আপু আমার দিকে তাকাও ভীরু চোখে পানি মুছে তাকায় রুহামা। নাজিহা কথা বলার সময় তার মাঝে একটা টিচার টিচার ভাব আসে আবার নেত্রীও মনে হয়। সে বলতে শুরু করলো। আচ্ছা বলতো কত সময় ধরে এই ছেলের সাথে আছিস। এক বছরইতো হবে তাইনা? এর মধ্যে তুই ছেলেটার সাথে সময় কাটিয়ে কতটুকু আপন হতে পেরেছিস বা করতে পেরেছিস তা তো আজকের তোকে দেখেই বুঝতে পারছিস। অথচ সেই জন্মের পর থেকে যেই মা বাবার সাথে আছিস তাদেরকে সেইটুকু সময় না দেয়ার পরও শুধু অভ্যেসের বশে টাইম কাটানোর পরও তারা দিনশেষে সন্তানের কতটা আপন তা সব সন্তানই একটা সময় বুঝতে পারে। এই বাঁধনটা মহান আল্লাহ গড়ে দিয়েছেন বলেই তারা যত কিছু করেন না কেন মানুষ দু'টোই সবশেষে ভালোবাসা ও আস্থার প্রতীক হয়ে সন্তানের মাথায় উপর

---

* ৪র্থ সেমিষ্টারের শিক্ষার্থী, কুরআনিক সায়েন্স এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

ছাদ হয়ে থাকেন। ঠিক তেমনি তুই যতই অন্যায় করিস না কোনো শেষ মূহুর্তে স্নেহ এবং সন্তান বাৎসল্য ক্ষমাকে সাথে করে নিয়ে এসে আগের সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। এভাবে যে পবিত্র বন্ধনগুলো সৃষ্টিকর্তা সন্তুষ্ট হয়ে করে দেন সেই সম্পর্কগুলোতে আর যাই হোক না কেন দিনশেষে একটা মানসিক প্রশান্তি থাকে। কিন্তু প্রভুর অবাধ্য হয়ে সে বন্ধনগুলো গড়ে উঠে সেখানে এই প্রশান্তিটা খুঁজতে গেলে চরম ভুল হবে রে। এই সম্পর্কে দিনের পর দিন একসাথে থাকার পরও মনে হবে মানুষটা বড্ড ফাঁকিবাজ। হবেইতো। যে তার সৃষ্টিকর্তার কর্তব্যে ফাঁকি দেয় সে এই নগন্য মানুষকে কেন ফাঁকি দিবে না। এটাতো গেল মনস্তাত্ত্বিক। ধীরে ধীরে কথাগুলো তার ভেতর নাড়া দিতে থাকে। তার নিরবতায় সেই প্রশ্নের উত্তর নাজিহা নিজেই দেয়। ছেলেটা বলেছিল যে তোমার চোখ দেখে প্রেমে পড়েছি চেহারা দেখে নয় অথবা বলেছিল যে তোমার রূপ দেখে তোমায় ভালো লেগেছে। হয়তো বলেছিল তোমার সম্পর্কে অনেক শুনেছি খুব ভালো তুমি আচ্ছা এসব বলার অধিকারটা কে দিয়েছে তাকে? আর যতই যেভাবে বলুক না কেন মনের কোনো এক কোণে শারিরীক আকর্ষণটা অবশ্যই লুকায়িত থাকে। কিন্তু এমনভাবে সেটা উপস্থাপন করার চেষ্টা করবে যেন এভাবে প্রেমে পড়াটা এক মহা পবিত্রতার কাজ। আর একটা কথা বলে কৌশলে ব্রেইন ওয়াশ করবে। সে আমার শরীরকে নয় মনটাকে ভালোবেসেছে। আর এই কৌশলের ফাঁদে তোর মত অনেকেই পা দেয়। মনেই থাকে না যে নারী পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে কখনো মন একা আসে না। এর সারাংশ এটা দাঁড়ায় যে সে তোকে বিয়ের আগেই পেতে চায়। কিন্তু কৌশলে এটাকে লুকিয়ে পবিত্রতার দোহাই দিয়ে ঢেকে সামনে হাজির করার জোর প্রচেষ্টা চালায়। আরে বাবা তোর গুণে মুগ্ধ হয়ে যদি সে তোকে সারাজীবনের জন্য চাইতো তাহলে কখনো এই পথে প্রেম নিবেদন করতো না। বৈধ উপায়ের সেই সময়টার জন্য অপেক্ষা করতো। যে তার প্রভুকে ফাঁকি দিয়ে এভাবে বলতে পারে। সে মানুষকে বোকা বানিয়ে যে অন্য কাউকে ঠিক এভাবে বলতে যাবে না তার গ্যারান্টি কে দিবে?

রুহামার চোখের পানি বন্যার আকারে গড়াচ্ছে। নাজিহার উচ্চারিত প্রত্যেকটা শব্দ ভাঙ্গা হৃদয়টাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। নাজিহা বাঁধা দিলনা। কেঁদে হালকা হয়ে যাক মেয়েটা। বুক থেকে ভারী বোঝাটা নিঃশ্বাস হয়ে নেমে যাক। ছোট্ট শিশুটাকে যেভাবে হাতগুলো মায়ের মুঠোয় পুরে হাটতে শেখায় ঠিক সেভাবে রুহামাকে ভরসা দিয়ে তার চোখের গভীরতা উপলব্ধি করতে করতে নাজিহা বলল আমার ছোট্ট পরীটা এইবার অন্তত মনটাকে হালকা করে ঠিক হয়ে যা। স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা কর আপু একটা কথা বিশ্বাসে রাখতে চেষ্টা কর যে যখন সময় হবে তোর জন্য স্রষ্টার নির্দিষ্ট করে দেয়া মানুষটা ঠিকই হাজির হবে। অপেক্ষা এবং তাকদীরের ওপর ভরসা রাখতে হবে। কেন এসব অনৈতিক সম্পর্কের চলনায় ভরা কথার ফুলঝুরি সাজিয়ে সাজিয়ে অযথা ক্লান্ত হচ্ছিস। কত কর্তব্য পথে আছে সামনে সেসব পালন করার জন্য তৈরি হও বোকা মেয়ে।

অনেক্ষণ পর রুহামা কথা বলল আপু চলো নিচে যাই। নাজিহা ভারমুক্ত হলো। এই মেয়েটাকে খুব ভালোবাসে সে। মেয়েটার অবনতি চোখের সামনে দেখতে দেখতে আল্লাহর কাছে চেয়েছে। যাতে মেয়টার একটু সুমতি হয়। আল্লাহ তার দোয়া ফেরত দেননি। রুহামার বিক্ষত মনটা শান্ত হতে থাকে। সিড়ি ভেঙ্গে নামতে নামতে পদক্ষেপ দৃঢ় হয়। এক পা দুপা নামে আর মনে হতে থাকে না নেইতো কারো প্রতিই কোনো অভিযোগ। এমনকি নিজের প্রতিও নেই।

এশার আজান হচ্ছে, আজানের ধ্বনিটা মনের অনেক গভীরে আঘাত করলো। ঐ তো ঐ ডাকেই সাড়া দিতে হবে। এটা এমন একটা আহ্বান যার সাড়া শুধুমাত্র বিশ্বাসীরাই সঠিকভাবে দিতে পারে। প্রস্তুত হয় রুহামা।

একটি অপ্রস্ফুটিত গোলাপের চির বিদায় ও আমাদের সান্ত্বনা

মোঃ ইকবাল হাসেন

আসলে আমাদের গর্বের জায়গাটুকু এখানেই। বিশ্ববিদ্যালয় লাইফে এটি হচ্ছে আমার সুখকর একটি অভিজ্ঞতা যা এর আগে অর্জিত হয়নি। আমাদের একজন ছোটভাই ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত, দেশে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরও অবশেষে ডাক্তার বললেন যে, এখানে রোগীর যথোপযুক্ত চিকিৎসা নেই। অর্থ্যাৎ তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিয়ে যেতে হবে যার জন্য খরচ গুনতে হবে প্রায় ১৫ থেকে ১৬ লক্ষ টাকা। ওর বাবা হচ্ছেন গ্রামের সাধারণ একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসার সামান্য আয় হতেই পাঁচ মেয়ে এক ছেলে এবং স্ত্রী সহ মোট আট সদস্যের পরিবার চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তার পক্ষে চিকিৎসা বাবদ এ ব্যয়ভার সামলানো সম্ভব নয় এমনকি পরিবারের গচ্ছিত সামান্য অর্থকড়ি ও সকল সম্পদ বিক্রি করে হলেও নয়। আসলে আমাদের দেশের মত উন্নয়নশীল দেশে মধ্যম আয়ের পরিবারের লোকদের জন্য এ ব্যয়ভার সামলানো অতি সহজ নয়। বরং সাধ্যের বাইরে বললেই বা অতিরিক্ত হবে কোথায়। শুনতে পারলাম পরিবারের সব কিছু উজাড় করে দিয়ে নাকি প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করতে তারা সক্ষম হয়েছে। বাকী যে বিশাল অংকের টাকার বন্দোবস্ত তারা করতে পারেনি, তা নিয়ে পরিবারের সবাই হতাশাতেই আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে। আসলে এ মূহুর্তে তারা কি করবে তা ভেবে উঠতে পারছেন না। একদিকে তাদের সকলের আদরের টুকরা পরিবারের একমাত্র নয়নের মনি সকলের ছোট স্বপ্নের উদিত সূর্য অন্যদিকে বিশাল আর্থিক পাহাড়। একদিকে স্বপ্নজয়ের স্বাধ, অন্যদিকে অর্থনৈতিক দৈন্যতার ভয়াল থাবা। অর্থের বিশাল এ বাঁধাকে অতিক্রম করতে না পারলে হয়ত তাদের সকলের হৃদয়ের সুর প্রাণের আকুতি ছোট্ট এ সোনামনিটিকে হারাতে হবে চির জীবনের তরে। ভাবতেই যে পরিবারের সকলের চোখে অমানিশা নেমে আসে। কিন্তু তারা কি করবে কোথায় যাবে কিছুই যেন বুঝতে পারছে না। হিসাব যতবারই মিলানোর চেষ্টা করে প্রতিবারই কোথায় যেন ভুল হয়ে যায় যে ভুলটি কেউই অতিক্রম করতে পারে না। স্বপ্ন বুনার পর তা ভঙ্গ হয় ফের স্বপ্ন বুনে পুনরায় স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। মনে হয় স্বপ্ন ভঙ্গই যেন তাদের নিয়তি। এভাবে করে পরিবারের সবাই চরম হতাশাগ্রস্থ ভাবে দিনতিপাত করছে। ফয়সাল হাদিস ডিপার্টমেন্টের একজন মেধাবী ছাত্র। পরীক্ষা দিয়ে ডিপার্টেমেন্ট থেকে বের হচ্ছি এমন সময় সে এসে বললো: ভাই, আমি তো আপনাকে খুঁজতাছি! বললাম কি ব্যাপার বলো। ভাই আপনাকে খুব জরুরী প্রয়োজন। বলো সমস্যা নাই। আপনি কি ফ্রি আছেন? হ্যাঁ পরীক্ষা শেষ করে বের হলাম ফ্রি আছি বলো। একটু অদূরে একান্তে টেনে নিয়ে ভাই আমাদের ক্লাসের রিয়াদ, ওর মামাত ভাই ব্লাড ক্যান্সার আক্রান্ত। এখন ভাই একটু সাহায্যের প্রয়োজন। কথা বলার মাঝেই ওর হাতে কিছু কাগজ পত্র দেখতে পেলাম। ভাবলাম হয়তো বা কোনো বিষয়ের শীট হবে। কেননা পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে যে কারো হাতেই দুএকখানি শীট শোভা পায়। দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেই কাগজে এক কোণে দেখতে পেলাম ছোট্ট একটি শিশুর নিষ্পাপ চেহারা। কি যেন বলতে চাচ্ছে সে। ছেলেটির চেহারা দেখেই আঁচ করতে পারলাম যে, সে খুবই চতুর এবং দুষ্টু প্রকৃতির হবে। আমার কাছে এ রকমের ছোট দুষ্ট ছেলেগুলো খুবই পছন্দের। ক্লাসে একদিন ছোট বেলার দুষ্টামি বা ছেলে মেয়েদের ছোট বেলার দুষ্টামীর কথা উঠল। ক্লাসটি ছিল ড. নাজমুল হক নদভী স্যারের। স্যার ছোট বড় সব ছাত্রদেরকেই বাবা বলে সম্বোধন করেন। এ প্রসঙ্গে উঠতেই স্যার বলে উঠলেন আরে বাবা দুষ্টামী করার জন্য তো মেধা লাগে। যে ছোট বেলার খুব দুষ্ট থাকে, বুঝতে হবে তার মেধা ভালো বেটা। বেটা শব্দটিও স্যারের মুখে বেশ পরিচিত। এ শব্দটি স্যারকে খুব মানায়। মায়ের মুখে কতবার শুনেছি। ছোট বেলায় আমিও নাকি খুব দুষ্ট ছিলাম। সহপাঠীরা নাকি আমার সাথে সহজে পেরে উঠত না। স্যারের কথাটি মনে পড়তেই সাথে সাখেই ছোট্ট এ নিষ্পাপ ছেলেটির প্রতি মায়া বেড়ে গেল। সাথে সাথে মায়ের কথাগুলো স্মরণে আসার পর ভালোবাসা আরো বেড়ে গেল। বললাম দেখি তোমার হাতে এগুলো কি। অমনিতেই দেখতে পেলাম একটি কাগজের দু'পাশেই ওর ছবির সাথে লিখা রয়েছে মানবিক সাহায্যের আবেদন। পড়ে দেখতে পেলাম মেডিকেলে তার যাবতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার ফাইল এবং একটি আবেদন পত্র। ফয়সাল বললো ভাই, এই আবেদন পত্রটি নিয়ে আমাদেরকে

* গ্রেজুয়েট সাইন্সেস অব হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

ভিসি স্যারের কাছে যেতে হবে। সিনিয়র ভাইদের কাছে গিয়েছিলাম উনারা বললেন ভি.সি স্যারের সুপারিশ আনতে পারলে টাকা উত্তোলনে অফিসিয়াল কোনো সমস্যা হবে না। আমরা এখন প্রক্টর স্যারের সত্যায়নের জন্য যাব। সেখান থেকে ভিসি স্যারের কাছে যেতে হবে। গিয়ে পৌঁছলাম প্রক্টর স্যারের অফিসে। সালাম দিয়ে প্রবেশ করার পর কুশল বিনিময় হলো। জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কোন ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছো? আমরা সকলেই সমস্বরে বলে উঠলাম হাদিস ডিপার্টমেন্টের স্যার। আমাদের সাথে দু'জন ছিল গেঞ্জি পরা অবস্থায়, গেঞ্জিতে ইংরেজীতে বড় বড় অক্ষর দিয়ে কি যেন লিখা ছিল। স্যার বলে উঠলেন কি ব্যাপার ইমাম বুখারী কি এগুলো পড়েছে? আর মুচকি মুচকি হেসে গেঞ্জিতে লিখা শব্দগুলো পড়ছেন। এরপর বললেন এগুলো ভালোনা। আর অনুপ্রেরনার সুরে বলে উঠলেন হাদিসের ছেলেদের হতে হবে ইমাম বুখারীর মত। আমি বিষয়টি পর্যবেক্ষন করছি আর মুচকি হাসছি। কেননা আমি গিয়েছিলাম পাঞ্জাবী পরেই। এজন্য এ নিয়ে আমার ভাবার প্রয়োজন পড়েনি। নয়তোবা আমাকে কিছুক্ষণ কষ্টের হাসি হাসতে হতো। ফয়সাল আমার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে বললো, ইস! গেঞ্জি পরে আসাটা ঠিক হয়নি। আমি বললাম, আরে সমস্যা নাই। স্যার দুষ্টুমি করছেন। এমন সময় প্রক্টর স্যারের কাছে ভিসি মহোদয়ের ফোন চলে আসল। দীর্ঘক্ষন কথাবর্তা চলছে উভয়ের সাথে। আমরা এ সুযোগ একটু নাড়াচাড়া দিয়ে স্বাভাবিক হয়ে নিলাম। কিভাবে কি করলে ভালো হয় তা নিয়ে একজন অপরজনের সাথে পরামর্শের সুযোগ হাতছাড়া করলাম না। বাহিরে থেকে পিয়ন এসে স্যারকে বললেন, স্যার এখানে আপনার সাইন লাগবে। মনে হয় অফিসিয়াল কোনো কিছু হবে। স্যার ফাইলটির দিকে সামান্য চোখ বুলিয়েই স্বাক্ষর করে দিলেন। পিয়ন চলে গেল। আমরা মনে মনে ভাবলাম, ইস! স্যার যদি আমাদেরও এরকম করে স্বাক্ষর করে দিতেন, তাহলে কতইনা ভাল লাগত! কেননা স্যারের কাছে গিয়েছি বেশ কিছুক্ষণ হয়েছিল। ধৈর্য্যের বাঁধ কেমন জানি একটু নাড়াচড়া দিয়ে উঠতে চাইছিল। অমনিতেই স্যারের কথা শেষ হলো স্যার আমাদের কাছে বিষয়টি ভালভাবে জেনে নিলেন এবং সে ছেলেটির ছবির দিকে বেশ কিছু সময় তাকিয়ে বলে উঠলেন, এ তোমাদের কার কি হয়? ফয়সাল রিয়াদের দিকে ইশারা করে বললো স্যার রিয়াদের মামাত ভাই। স্যার ওর কাছ থেকে ছেলেটির যাবতীয় তথ্য জেনে নিলেন। সব কিছু শুনে স্যার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন ওর অভিবাবক কেউ কি এসেছে? ফয়সাল বললো জ্বী স্যার ওর বড় বোন এসেছেন এখানে। স্যার বললেন ওকে আসতে বলো, রিয়াদ গিয়ে উনাকে নিয়ে আসলেন। স্যারের সাথে যাবতীয় কথাবর্তা শেষে বললেন টাকা উঠাবে কে? আমরা বললাম স্যার আমরা সবাই মিলে। সেখানে আমরা ছিলাম ছয়জন প্রায় স্যার বললেন ঠিক আছে টাকা উঠিয়ে তোমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রধানের কাছে দিবা ওখান থেকে ওর অভিভাবক নিয়ে যাবেন। আমরা বললাম ঠিক আছে স্যার। স্যারের সত্যায়ন নিয়ে বের হয়ে আমরা গেলাম ভিসি মহোদয়ের অফিসে। প্রক্টর স্যারের অনুমোদনের ফলে মনোবলটা একটু বেশী ছিল। সময় ক্ষেপন না করে পিয়নকে জিজ্ঞাসা করলাম স্যার আছেন কি না? উনি বললেন স্যার অফিসে রয়েছেন। আমাদের ফাইল দেখে নিয়ে উনি বললেন এটি আপনারা রেজিষ্টার অফিসে থেকেই করতে পারেন। কেননা এ সংক্রান্ত বিষয়াদি রেজিষ্টার অফিস থেকেই করতে হয়। গিয়ে উঠলাম রেজিষ্টার অফিসে। প্রথমেই স্যারকে সালাম দিলাম। কোনো উত্তর পেলাম না। পাশের রুমে গিয়ে কিভাবে কি করতে হয় যাবতীয় তথ্য জেনে চলে গেলাম অফিসে। বিষয়টি আমাদের জন্য খুব একটা সহজ ছিল না। কেননা আমাদের সকলেরই এটি ছিল প্রথম অভিজ্ঞতা। ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত একাধিক কার্যক্রমে সকলেরই অংশ গ্রহণেরন অভিজ্ঞতা থাকলেও অফিসিয়ালি এটিই ছিল প্রথম। স্যার প্রথমে একটু নিয়ম নীতির কথা ভালো করেই শুনালেন। পরে অবশ্যই আমাদের সকলের দৃঢ় অবস্থানের প্রসংশা করে সত্যায়ন করে দিলেন। আসলে মাঝে মাঝে নিয়ম নীতির কথা শুনতেও কেন জানি মন চায় না। অফিসিয়াল সকল কার্যাদি শেষ করে আসতে আসতে সকলে মিলেই ভাবতে লাগলাম কিভাবে কি করা যায়। ফয়সালকে জিজ্ঞাসা করতেই বলে উঠল ওরা কয়েকটি বক্স বানিয়ে রেখেছে। টাকা উত্তোলনের জন্য আমরা আমাদের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিলাম। সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সামনে গিয়ে পৌঁছতে খানিকটা দেরী হয়ে গিয়েছিল আমার। ফয়সাল, ফয়জুল্লাহ, রিয়াদ ও মামুন ভাই বক্স হাতে শুরু করে দিয়েছে টাকা উত্তোলনের কাজ। লাইব্রেরীর সামনে গিয়ে দেখলাম একজন বক্স বানাচ্ছে। আমার কাজ শুরু হলো বক্স বানাতে সহায়তার মধ্য দিয়ে। আমরা দুজন মিলে শুরু করলাম কাজ। আমার সাথে ছিল মামুন ভাই, বক্সটি কিছুক্ষণ আমার হাতে কিছুক্ষণ মামুন ভাইয়ের হাতে এভাবে করে চলতে লাগল আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ছোট্ট ভাইটির জন্য। বক্সে উভয় পাশেই ওর ছবিসহ মানবিক সাহায্যের আবেদন লিখা ছিল। আমাদের কথা ছিল ভাইয়্যা আমাদের ছোট্ট ইয়াছিন ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত। চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। যদি পারেন একটু সহায়তা করেন। দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য বক্সের উপর আমরা ইয়াসিনের যে ছবিটি দিয়েছিলাম এবং বড় অক্ষরে মানবিক সাহায্যের কথাটি লিখেছি তা দেখেই যে কেউ সহজে অনুমান করতে পারত যে, এটি কোনো মানবিক সাহায্যেরই আবেদন হবে।

এভাবে করে কখনও জনে জনে কখনও বাসের ভেতর কিংবা কখনও ছাত্র ভাইদের আড্ডার ফাঁকেই আবার কখনও ছাত্রী আপুদের কোমল সুরের খুনসুটি আর নিষ্পাপ চাহনীর আড়ালেই চলতে লাগল আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, ছোট্ট ভাইটির সাহায্যোর্থে। একটি বিষয় আমাকে খুবই বিমোহিত করেছে তা না বলে পারছি না। তা হচ্ছে, আমরা যখনই কোনো ভাই কিংবা বোনের কাছে গিয়ে আমাদের ছোট্ট ভাইটির জন্য সাহায্যের আবেদন করতাম, সাথে সাথেই কোনো বাক্য ব্যয় ব্যতীত সকলেই দুহাত উজাড় করে সামিল হতো। মনে হচ্ছিল, যেন আমাদের ছাত্র ভাই বোনরা পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছে টাকা দেয়ার জন্য। এমনও ঘটেছে একজনের কাছে একবার নেয়া হয়েছে খানিক পরে ওনার সাথে দেখা হলে বলার পর তিনি দ্বিতীয় বারও সামিল হয়েছেন। আমাদের এ সাহায্য যাত্রায় কোনো জন দশ কোন জন বিশ কেউ আবার বিশ পঞ্চাশ বা একশত টাকা দিয়ে অংশীদার হয়েছে। টাকার পরিমাণটা যাই হোক ফয়সালদের কাছে যখন শুনেছি যে কোনো একটি বাসের নাকী সকলেই অংশগ্রহণ করেছেন, সত্যিই তখন নিজেকে আমি খুঁজে পেয়েছি নতুন এক ভুবনে! চির উদ্যমে, নব আঙ্গিকে। সময় ঘনিয়ে এসেছে ক্যাম্পাসের বাস শহর অভিমুখে ফিরে যাবার। ক্ষনিক পর বাস ছেড়ে দিল আমরা সকলেই একত্রিত হলাম। আমাদের কেন্দ্রিয় মসজিদের সামনে এক একজন এক এক অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করতে লাগলাম, একে অপরের সাথে। সকলের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহনের ফলে আমাদের সকলের হৃদয়েই যেন প্রাণের জোয়ার বইতে লাগল সকলের ভেতরেই যেন একটা নব উদ্দীপনা কাজ করছে। এর মধ্যেই ফয়সাল এবং রিয়াদ বলে ওঠে ড. মফিজুর রহমান আল আজহারী স্যারের কথা। স্যার নামাজ শেষ করে বেরিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় স্যারের কাছে যখন যাওয়া হলো তিনি নাকি আমাদেরকে এই শুভ উদ্যোগের জন্য উৎসাহিত করেছেন চরমভাবে এবং পাশাপাশি আমাদের ছোট্টভাই দূরারোগ্য ব্যাধিত আক্রান্ত ইয়াছিনের জন্যও খুবই মর্মাহত হয়েছে। ব্যথাতুর হৃদয়ে আক্ষেপ নিয়ে বললেন ছোট্ট এ নিষ্পাপ ছেলেটির জন্য খুবই কষ্ট হচ্ছে। আল্লাহ আমাকে যদি তাওফিক দিতেন তাহলে ওর পুরো চিকিৎসা খরচ আমিই দিয়ে দিতাম। সহপাঠীদের কাছে স্যারের এমন সব কথা শুনার পর স্যারের প্রতি সম্মান এবং ভালোবাসার জোয়ার বয়ে গেল। চোখের কোণে জল এসে কড়া নাড়ছে কখন যেন বেরিয়ে যায় এমন উপক্রম হলো। কথাটি অতি ক্ষুদ্র হতে পারে কিন্তু যিনি এমন কথাটি বলেছেন তাঁর হৃদয়ের বিশালতা পৃথিবীর কোনো বাটখারায় হয়ত পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এভাবে করে ছাত্র ভাই বোনদের দ্বারে দ্বারে সকালেই কিংবা বিকালে একাকী কিংবা স্বমস্বরে চলার পথে কিংবা ডিপার্টমেন্টের সামনে চলতে লাগল আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সকলে মিলেই। পাশাপাশি প্রত্যেক হল থেকে টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে নকীব ভাইদের নিঃস্বার্থ এবং ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা ভোলার মত নয়। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে নিজের স্বপ্নের ক্যারিয়ার গড়া ভালো ফলাফলের নেশা বাদ দিয়ে নেমে পড়েছেন আমাদের সহযোগিতায়। যা স্মরনে থাকবে আজীবন। আমাদের এ অভিযানের স্বার্থহীন তরীতে ছাত্র-ছাত্রী ভাইবোনদের ভালোবাসার জোয়ারে দানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতের সম্মিলনে এসে পৌছল প্রায় অর্ধলক্ষ টাকা। টাকার পরিমাণ আমাদের ছোট ভাইটি ইয়াছিনের চিকিৎসা খরচের তুলনায় অধিক কম হলেও ইয়াছিনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সকলের ভালবাসার ক্লান্তিহীন নজীর বিহীন এ প্রচেষ্টা এবং স্বার্থহীন একদল ভাই বোনদের হৃদয়ের আকুতিও দানের হৃদয় মায়ার টান কিন্তু কম নয়।

মনে মনে ভাবি আসলে আমার গর্ব করার জায়গা এখানেই। স্বপ্ন দেখা এবং স্বপ্ন দেখানোর জায়গাও এটিই। সারা জগত জুড়ে চলছে যখন মহা অমানিষা আর স্বার্থবাদীদের ভয়াল থাবা ঠিক সে মূহূর্তে এসে "আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম" নামক অঙ্গিনায় নিঃস্বার্থ এবং অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসার প্রাণ ব্যাকুলতার এমন দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল যা আমার হৃদয় গহীনে স্বপ্নতরীর স্বপ্ন বোনার খোরাক। আমি আবার হারিয়ে যাই গভীর স্বপ্নের নীড়ে গিয়ে বাসা বুনি নতুন করে নতুন ভাবনার। এ তো আমার হৃদয়ের সুর আর প্রাণের আকুতি। আমার হৃদয় হতে নিজের অজান্তেই বেরিয়ে যায় প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় মোর তোমাকে নিয়ে আমি গর্ব করি তুমি দীর্ঘজীবি হও। তোমার স্বকীয়তা ছড়িয়ে দাও বিশ্বময়। এভাবে করে হারিয়ে যাই আমি নবীন স্বপ্ন ভাবনার অতলতলে। সেথায় গিয়ে সান্তনার বাতাসে জোয়ারের পানিতে আমার হৃদয় ডানামেলে দিয়ে হাবুডুবু খাই। সে আনন্দ ক্ষনেই থাকতে চাই আমি চিরকাল এমন ভাগাভাগি করতে অপরের সাথে। ছড়িয়ে দিতে চাই আমি বিশ্বালয়ে। ইয়াছিনকে বাঁচাতে তার পরিবার কিন্তু কম যায়নি এর দ্বারে ওর দ্বারে। এ হসপিটাল ঐ হসপিটাল করতে করতে অনেক হাসপাতলই ইতোমধ্যে ঘুরে এসেছে। বলতে গেলে চেষ্টার কোনো প্রকার ক্রটিই করেনি তার মা বাবা। অবশেষে ডাক্তারদের পরামর্শ এবং তার অবস্থা দিনকে দিন অবনতি দেখে সিদ্ধান্ত হলো ভারতে নিয়ে যাবে। ভারতে নিয়ে যাওয়ার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেও ভিসা পাওয়া গলে না। এদিকে তার পরিবারেও সকল স্বপ্ন যেন অমনিষার ঘোর থাবায় ধূলিস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে। একদিকে ভিসা না পাওয়ার বেদনা অন্যদিকে ইয়াছিনের অবস্থাও ক্রমাগত অবনতির

দিকে দু'টি মিলে যেন তারা চোখে মুখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ঘোর অন্ধকারের দিকে ধাবিত হতে লাগল তাদের সব আশা। শুনতে পারলাম পূঁজা কেন্দ্রিক জটিলতার কারণেই নাকি ভিসা পেতে দেরী হচ্ছিল। বাস্তবতাকে মাথা পেতে নিয়ে ইয়াছিনের পরিবার ছুটল ঢাকা অভিমুখে। বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি কারনোর পরও কোনো উন্নতি দেখা গেল না। ক্রমেই মলিন হয়ে আসছে ইয়াসিনের চেহারা অতিরিক্ত রক্তক্ষরণও যেন বেড়েই চলছে। অন্যদিকে তার মা বাবা এবং বোনদেরও হৃদয়ে রক্তক্ষরণ যেন সাগরে পরিণত হতে যাচ্ছে। সর্বশেষ ইয়াছিনকে ভর্তি করানো হলো ধানমন্ডি মডার্ন হাসপাতাল ঢাকায় বেশ কিছুদিন চিকিৎসা চললো। অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরনের কারণে অবশেষ তাকে আই.সি.ইউ তে ভর্তি করানো হলো। ডাক্তারদের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে তার দু'দিন পর ১৫/১০/১০১৬ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিট বিশ্বাবাসীর চোখ ফাঁকি দিয়ে ইয়াছিন চলে গেল না ফেরার দেশে।

এ মূহুর্তে ইয়াছিনের পরিবারকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা আমার নেই। ছোট্ট ভাই ইয়াছিন এর অকাল মৃত্যুর সংবাদটি যখনই শুনছি সাথে সাথেই দু চোখের কোন হতে গড়িয়ে পড়তে লাগল অথৈ জল। কোনো বাঁধাই যেন মানছে না জানি না ইয়াছিনের পরিবার এ মূহুর্তে কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পাবে কি না। আর পাবেই বা কিভাবে? পাঁচ বোনদের মধ্যে সেই তো ছিল তাদের একমাত্র আদরের ভাই। তাকে নিয়ে কত স্বপ্নইনা ছিল তার বাবা মায়ের। কথা আর কি বলবে তাদের আদরের হীরা খন্ডকে হারিয়ে হয়তবা চোখের জলও শেষ করে ফেলেছেন। আর তার বোনরা হয়তো তাদের স্বপ্ন ভঙ্গের এ মূহুর্তে তাদের হারিয়ে যাওয়া ভাইটির জন্য চক্ষুজল বিসর্জন দিয়ে বিলাপ করতে করতে পাথর হয়ে যাচ্ছে। ইয়াছিনের পরিবারে শোকের ছায়া আর তাদের বোনদের হৃদয় ছেঁড়া আকুতির মাঝেও আমি কিছু আশা লালন করি হৃদয় মাঝে। সান্ত্বনা খুঁজে পাই গহীন স্বপ্ন নীড়ে তা হলো ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত ছোট্ট ভাইটির সহযোগিতায় এগিয়ে আসা কিছু তরুনদের নিয়ে। নিঃস্বার্থভাবে ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের মানসিকতায় অক্লান্ত পরিশ্রম করা কিছু ভাইদের নিয়ে। অপরের সহযোগিতায় অংশগ্রহনের জন্য প্রতিযোগিতা মূলক কিছু দৃশ্য যখন আমার চোখের সামনে ভেসে আসে। ছোট্ট ভাইটির মরণ ব্যধীতে আক্রান্তের সংবাদ কিছু ব্যক্তির মন-ব্যকুলতা, সু-পরামর্শ আর সহযোগিতা পরায়ন কিছু ভাইদের অকৃত্রিম ভালোবাসা। এ নিয়েই তো আমি স্বপ্নদেখি। যারা নিজের কথা ভাবে না। দেশ, সমাজ, মানবতার মুক্তির চিন্তায় যারা থাকে সদা বিভোর। যে সকল তরুনরা অপরের উপকারেই নিজে তৃপ্তি পায়। অকৃত্রিম প্রেম বিলিয়ে যায় নিঃস্বার্থ ভাবে। আমি আছি সে সব তরুনদের বিজয়ের দৃশ্য দেখার অপেক্ষায়। সবশেষে এটিই বলব ইয়াছিন তুমি ভালো থেকো পরপারে।

মহান প্রভুর পরম করুনায়। ছোট্ট ভাইটি আমাদের সকলের অকৃত্রিম ভালোবাসা নিয়ো।

কুষ্ঠরোগী, অন্ধ ও টেকোর কাহিনী

বনী ইসরাঈলের মাঝে তিনজন ব্যক্তি ছিল- কুষ্ঠরোগী, টেকো ও অন্ধ। মহান আল্লাহ্ তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন এবং তাদের নিকট একজন ফেরেশতা পাঠালেন। অতঃপর কুষ্ঠরোগীর কাছে এসে তিনি বললেন, 'তোমার সবচেয়ে পছন্দের জিনিস কোনটি? সে বলল, 'সুন্দর রং ও সুন্দর চামড়া। কেননা মানুষ আমাকে ঘৃণা করে'। ফেরেশতা তার শরীরে হাত বুলালেন। এতে তার রোগ দূর হল এবং তাকে সুন্দর বর্ণ ও সুন্দর চামড়া দান করা হল। অতঃপর তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নিকট কোন্ সম্পদ সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয়? সে বলল, উট অথবা গরু'। এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে যে, কুষ্ঠরোগী বা টেকো দু'জনের একজন বলেছিল উট আর অপরজন বলেছিল গরু। তাকে তখন দশ মাসের গর্ভবতী একটি উটনী দেয়া হলো। ফেরেশতা বললেন, 'আল্লাহ্ এতে তোমায় বরকত দিন'।

তারপর তিনি টেকো ব্যক্তির কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার সবচেয়ে পছন্দের জিনিস কোনটি? সে বলল, 'সুন্দর চুল এবং এই টাক হ'তে মুক্তি, লোকেরা যার কারণে আমাকে ঘৃণা করে'। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তার মাথায় হাত বুলালেন। এতে তার টাক ভাল হয়ে গেল এবং তাকে সুন্দর চুল দান করা হলো। এরপর ফেরেশতা বললেন, 'কোন মাল তোমার নিকট অধিক প্রিয়'? সে বলল, গরু। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দেয়া হ'ল। ফেরেশতা বললেন, আল্লাহ্ এতে তোমাকে বরকত দিন।

তারপর ফেরেশতা অন্ধ ব্যক্তির কাছে এসে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার অধিক পছন্দের জিনিস কোনটি'? সে বলল, 'আল্লাহ্ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিন, আমি যাতে মানুষকে দেখতে পারি'। ফেরেশতা তার চোখ স্পর্শ করলেন। এতে তার চোখের দৃষ্টি আল্লাহ্ ফিরিয়ে দিলেন। এরপর ফেরেশতা প্রশ্ন করলেন,'কোন মাল তোমার নিকট অধিক প্রিয়'? সে বলল, ছাগল। তাকে তখন এমন ছাগী দেয়া হ'ল, যা অধিক সংখ্যক বাচ্চা দেয়।

তারপর উট, গাভী ও ছাগলের বাচচা হ'ল। ফলে একজনের উটে ময়দান ভরে গেল, অপরজনের গরুতে মাঠ পূর্ণ হয়ে গেল এবং আর একজনের ছাগলে উপত্যকা ভরে গেল। তারপর ফেরেশতা কুষ্ঠরোগীর কাছে তাঁর প্রথম রূপ ধারণ করে এসে বললেন, 'আমি একজন মিসকীন। সফরে আমার সবকিছু নিঃশেষ হয়ে গেছে। আজ আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ নেই, যার সাহায্যে আমি আমার গন্তব্যে পৌছাতে পারি, তারপর তোমার সহায়তায়। যে আল্লাহ তোমাকে সুন্দর বর্ণ, সুন্দর ত্বক ও সম্পদ দিয়েছেন, সে আল্লাহর নামে তোমার নিকট আমি একটা উট চাচ্ছি, যার সাহায্যে আমি গন্তব্যে পৌছাতে পারি'। সে বলল,'(আমার উপর) অনেকের অধিকার রয়েছে'। ফেরেশতা বললেন, 'তোমাকে বোধ হয় আমি চিনি। তুমি কি কুষ্ঠরোগী ছিলে না? লোকেরা তোমাকে কি ঘৃণা করত না? তুমি না নিঃস্ব ছিলে? অতঃপর আল্লাহ্ তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন'। সে বলল, 'এই সম্পদ তো আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্বপুরুষ থেকে পেয়েছি'। তিনি বললেন, 'তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও, তাহলে তোমাকে যেন আল্লাহ্ আগের মতো করে দেন'।

এরপর তিনি টেকো ব্যক্তির কাছে তাঁর প্রথম রূপ ধারণ করে এসে প্রথম লোকটিকে যা বলেছিলেন তা বললেন এবং সেও একই উত্তর দিল,যা পূর্বের লোকটি দিয়েছিল। ফেরেশতা একেও বললেন,'তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহ্ যেন তোমাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন'। এরপর ফেরেশতা অন্ধ ব্যক্তির কাছে তাঁর আগের রূপ ধারণ করে এসে বললেন, 'আমি একজন মিসকীন মুসাফির। আমার সবকিছু সফরে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন গন্তব্যে পৌছাতে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো উপায় নেই, তারপর তোমার সহায়তায়। সেই আল্লাহর নামে তোমার কাছে একটি ছাগল সাহায্য চাচ্ছি, যিনি তোমাকে তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন'। এ ছাগলটি দিয়ে আমি বাড়ি পৌঁছাতে পারব। লোকটি বলল, 'আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ্ আমার দৃষ্টিশক্তি ফেরত দিয়েছেন। আমি দরিদ্র ছিলাম, আল্লাহই আমাকে ধনী করেছেন। কাজেই তোমার যত ইচ্ছা মাল তুমি নিয়ে যাও। আল্লাহর শপথ! মহান আল্লাহর ওয়াস্তে আজ তুমি যা কিছু নিবে, তার জন্য আমি আজ তোমার নিকট কোনো প্রশংসাই

দাবী করব না'। ফেরেশতা বললেন, 'তোমার সম্পদ তোমার কাছেই রাখ। তোমাদেরকে শুধুমাত্র পরীক্ষা করা হয়েছে। তোমার প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট এবং তোমার অপর দু'জন সাথীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন'।

[আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, বুখারী হা/৩৪৬৪ 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায়, অনুচেছদ-৫১; মুসলিম হা/২৯৬৪, মিশকাত হা/১৮৭৮ 'যাকাত' অধ্যায়, অনুচেছদ-৫]

শিক্ষা : সর্বদা আল্লাহর নেআমতের শোকর-গুযার হতে হবে।

অনুগল্প

মায়ের বনবাস

উম্মে সালমা

ছেলে বিয়ে করেছে। সংসারে বৃদ্ধ মা আর নববধু। কিছুদিন পর পুত্রবধু শাশুড়িকে তার সংসারে রাখতে চাইলো না। বউয়ের প্ররোচনায় ছেলে মাকে বনে ফেলে আসবে বলে সিদ্ধান্ত নিলো।

এক সকালে সে মাকে নিয়ে দূর পাহাড়ের দিকে রওয়ানা দিলো। পথে পড়লো গহীন বন। মা যেতে যেতে রাস্তার দু'পাশে গাছের ডাল কেটে কেটে ফেলে রাখছিলো। এতে ছেলের পথচলার গতিতে বাধা পড়লেও কিছু বললো না। শেষ সময়ে মায়ের সাথে ঝগড়া করতে চাইলো না হয়তো। মাকে গহীন বনের মাঝে রেখে ছেলে ফিরতি পথ ধরলো। মা পেছন থেকে তাকিয়ে রইলেন। দেখলেন গহীন বনে ছেলে পথ খুঁজে পাচ্ছে না। মা জোরে ডাক দিয়ে বললেন বাবা আমি জানতাম তুমি পথ হারিয়ে ফেলবে, তাই আসার সময় পথে পথে গাছের ডাল কেটে রেখে এসেছি। তুমি ওগুলো দেখে ঠিক ঠিক বাড়ি পৌছেঁ যাবে।

* ৫ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী, সাইন্সেস অব হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

কবিতা

জাগরণের ডাক

ছাবেরা খানম *

হে মুসলমান জাগো আর নয় চুপ
ঘুমিয়ে থেকোনা পড়বে গায়ে কোপ।
উত্তোলন কর তাওহীদের পতাকা
ঐক্যবদ্ধ হও নয় আর একা।
দেখ, একটু পর দেখা যাচ্ছে আলো
ঘুমিওনা আলোতে পাবে রাতের কালো।
পা বাড়াও আর হাত মিলাও
নাস্তিক বেঈমানের সাহস কমাও।
কণ্ঠকার্কীণ পথ সতর্ক হও
পড়বেনা শত্রুর ফাঁদে প্রতিজ্ঞা লও।
প্রতিক্ষা করছে বিশ্বজাতি
দ্রুত জ্বালাও আলোর বাতি।

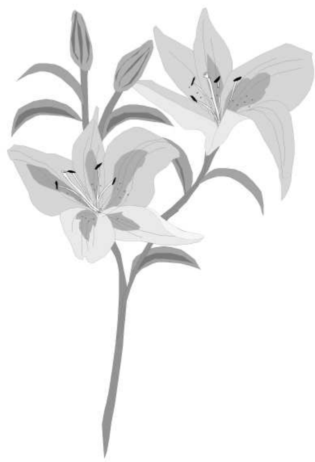

হেরেমের তৃষ্ণা

বিনতে ফারুক **

দেখা দে ইয়া ইলাহি ও মাদিনা কেসে বস্তি হে যাহাঁ পে রাত দিন মাওলা তেরি রাহমাত বাতাসতি হে। আমার গোহানহগার চোখ দু'টির আজও সুযোগ হয়নি বাইতুল্লাহ দেখার। অশান্ত মন এখনো লাভ করেনি সবুজ গম্বুজের দীদার। তৃষ্ণার্ত হৃদয় পান করেনি হেরেমের যিয়ারত সুধা। কালো গিলাফে ঢাকা কা'বার জামাল ও সৌন্দর্য দেখার খোশ কিসমত হয়নি এই হতভাগার হে পরওয়ার দিগার। তোমার রাহমাতের জোয়ারে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তো রওজা শরীফের মাকামে? দরূদ ও সালামের নযরানা পেশ করতে পারব তো পাক দর বারে? সবুজ সে গম্বুজের সৌন্দর্য সুষমায় উদ্ভাসিত হতে পারব তো? দু'চোখে সোনার মদিনার ধূলাবালি সুরাম মেখে নেয়ার সুযোগ দিবে তো?

আল্লাহ! আমার উড়ে যাওয়ার ডানা নেই মরুভূমির তপ্ত বালু পাড়ি দেব। সে শক্তি আমার পায়ে নেই। আমার পথ জানা নেই, আমার কাছে পাথেয় নেই। না আছে যোগ্যতা, না আছে সামর্থ্য। তবু আমার শুকনো দু'চোখ স্বপ্ন বুনেই যাবে। তোমার হাবীবের রওযা যিয়ারতের তামান্নায় প্রতীক্ষার দিন গুণেই যাবো।

তোমার যখন ইচ্ছে এই অধমকে ডাক দিয়ো। লাব্বাইক বলে হাযির হওয়ার তাওফিক দিও। তোমার যখন ইচ্ছে আমার পিপাসায় ঠোঁটের সামনে পেয়ালা ধরো। আমি তখনই আমার দগ্ধ হৃদয়ের উত্তপ্ত পিপাসা মেটাবো। আমি শুধু তোমার হতে চাই মাওলা আর চাই তুমি আমার হও। এই আমার ফরিয়াদ মাওলা।

* ৭ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।
** ৭ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

প্রিয় ক্যাম্পাস

তানজিফা ইসলাম নাহিদা *

আ- আবেগের তাড়ায় এসেছি তোমার বুকে
ন্ত- অন্তর জুড়ে পেয়েছি তোমাকে,
র্জ- অর্জন করিব করেছি পন,
তি- তিক্ত হয় কিন্তু, তোমার ত্বরায়
ক- কঠিন কিছু নয়, শুধু প্রশ্নের ধারায়।

ই- ইহাতে পাই যা নেই কারো কাছে,
স- সব মিলে যা পাই তা-ই তোমার কাছে,
লা- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
মি- মিশে যাই তোমার রূপের তরে।

ক- কাজে না মিলায় হতে পারি কি তোমার সনে?
বি- বিদ্যাপীঠে অন্যন্য শিল্পশালা,
শ্ব- বিশ্বের অন্তরে অজর ফুলকুঁড়ির মেলা।
বি- বিনা কাজে তোকে পাই কি করে?
দ্যা- দ্যাগ্র কণ্ঠে বলা যায়, তুমি-ই আলোকিত ফুল,
ল- লাল সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ রূপ।
য়- লইবো কিছু বলে করেছি ইচ্ছা কত।

চ- চাই মানুষ হইতে ভবিষ্যতে
ট্ট- চট্টলার গৌরব, বাংলা নয়, বিশ্বও কি পারে বাঁধতে,
গ্রা- গ্রামের মত গড়েছি বন্ধন ভুবনে
ম- মহান আল্লাহ-ই সমীচীন মোদের রক্ষা করিতে মান।

সুখের তরে

শাহরিন সুলতানা **

সুখের তরে স্বপ্ন গড়া।
সুখ যে তবু দেয় না ধরা।
সুখ নেই রে ধনে
সুখের বসত মনে
দুঃখের সাথে সুখও আছে
দুঃখ বিনা সুখ যে মিছে
যে সুখের পিছে ছুটছি মোরা
পাল্টেছি এই জীবন ধারা
সুখ কি তারে কয়?
নানান জনে, নানান রঙ্গে
সুখের অভিনয়।
সুখের আশায় লিপ্ত হয়ে
সুখের নেশায় মত্ত হয়ে
সুখ খুঁজে বেড়ায়।
কিন্তু হায়, সুখের দেখা নাই।
সুখ কি তবে অচীন পাখি?
শুধুই দুঃখের মাখামাখি।
সুখ কি তবে নেই এই ভবে?
শুধুই সুখের আশা রবে।
কখনও কি ধরা দিবে
দুঃখের জীবনে?
অনুভবে আছে রে সুখ।
মনের গহীনে।

---

* ৫ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।
** ৮ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

মানবতা

খাতুনে জান্নাত মুমু *

রুদ্ধ কপাটের আড়ালে, তুমি হে মানবতা!
উত্তাল সমুদ্রের সোপানে দাঁড়িয়ে
তুমি হে মানবতা!
বোমার আঘাতের বিভীষিকায় জর্জরিত তুমি
লক্ষ কোটি প্রাণের আর্তনাদ তুমি।
কাল বৈশাখের ঘন কালো মেঘের অবয়বে
কেন আটকে আছ তুমি?
হারিয়েছে তোমার সততা, ছেয়েছে তোমায় দূর্নীতি
কালো টাকার আড়ালে হারিয়েছে তোমার মহানুভবতা।
অটল পাহাড়ের প্রাচীর আজ কেনে,
দাঁড়িয়ে তোমার সম্মুখ পানে।
তুমি চেয়ে দেখ, তুমি ঘুরে দাঁড়াও
দেখ, তুমি কঠিন ভোগবাদের কবলে
আজও তুমি কেন তবু উঠছ না জেগে।
দাও ফিরিয়ে বেঁচে থাকার শক্তি
তোমার অনুরাগে
দাও ভাসিয়ে তোমার তরী দিগন্ত
ছোঁয়ার পানে।
মেঘ তরঙ্গ কেটে কেটে তুমি
উঠে এসো জেগে।
তুমি দূরন্ত
তুমি দুর্বার
তুমিই তো পার গাইতে গান সততার
তুমি শুভাশীষ, তুমি রনবীর
তুমি বাস্তবতা
তাইতো তুমি তুমিই সেই মানবতা।

ইসলাম

শাহরিন সুলতানা **

ইসলাম সে তো শুধু এক ধর্মের নাম নয়।
ইসলাম মুছে ফেলে সব সন্দেহ সংশয়।
ইসলাম দিয়েছে নারীকে মুক্তি যথাযথ সম্মান,
ইসলাম বলে এর ছায়াতলে সকল মানুষ সমান।
ইসলাম বলে জান্নাত আছে মা-বাবার ভালোবাসায়
ইসলাম বলে জান্নাত আছে তলোয়ারের ছায়ায়।
ইসলাম বলে রাখলে রোজা শরীর সুস্থ থাকে,
ইসলাম বলে পড়লে নামাজ মনটা ভালো থাকে।
ইসলাম বলে ধনীর সম্পদ পবিত্র হয় দানে।
ইসলাম বলে মু'মিন সেজন যেজন ইহা মানে।
ইসলাম বলে ইহাতে আছে হজ্জ ও ওমরার বিধান।
ফরয ইহা তাদের উপর যাহারা সামর্থ্যবান।
ইসলাম বলে আল্লাহর তরে করে দাও কুরবান
ইসলাম বলে হোকনা সে তোমার নিজ প্রিয় সন্তান।
ইসলাম বলে কন্যা সন্তান নয় কোনো বোঝা।
ইসলাম বলে থাকলে কন্যা জান্নাত হবে সোজা।
ইসলাম বলে কুরআন সে তো শুধু এক গ্রন্থের নাম নয়।
ইসলাম বলে, এটি এমন গ্রন্থ যার হবে না কোনো ক্ষয়।
ইসলাম বলে ততক্ষন মুসলিম পূর্ণ মুমিন নয়
যতক্ষন তার প্রতিবেশীরা অনাহারে রয়।
ইসলাম বলে ততক্ষন সে পূর্ণ মু'মিন নয়।
যতক্ষণ তার হাতও জিহবা নিয়ন্ত্রণে নয়।
ইসলাম বলে ততক্ষ মুসলিম জান্নাতে যাবে না
যতক্ষন তার আত্মীয়ের সাথে সুসম্পর্ক হবে না।
ইসলাম বলে সকল মু'মিন একটি দেহের সমান
ইসলাম তাই বিশ্ববাসীর পূর্ণ জীবন বিধান।

* ৫ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী, কুরআনিক সায়েন্স এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।
** ৮ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

মানব জাতি

আবদুল ওয়াদুদ *

আমাদের একটাই মাত্র পৃথিবী
একটাই আকাশ মাথার ওপর
চন্দ্র সূর্য একটিই
আমাদের একটিই মাত্র জাতি।
সমগ্র পৃথিবীতে আমাদের অধিবাস
আমাদের একটিই উঠোন এবং বিচরণক্ষেত্র
সুতরাং, আমাদের চাষাবাদের মাধ্যম হোক
একমাত্র মানবতা।
আমাদের লক্ষ্য হোক প্রমাণ দেয়ার
আমাদের উর্বর ভূমিতে আর
কখনো মানবতাহীন একটি গুল্ম ও
জন্ম নিবে না।
আমরা স্বাক্ষর রাখবো কালের পিঠে
হ্যাঁ আমরা মানব জাতি
আমরাই শ্রেষ্ঠ, সৃষ্টির সেরা
আমরা সম্মিলিত ভাবে টপকে যাবো
সকল বাধার উপত্যকা।
পৃথিবীর সমগ্র মানব মিলেই
আমাদের একটি মাত্র জাতি
সে হলো মানবজাতি
আমরা পরস্পর সকলেই ভাই
এই হোক আমাদের বড় পরিচয়।

আমি বলতে চাই

মোঃ রকিবুল ইসলাম **

নীতির পুরষ্কার তিরষ্কার জেনেও
আমি সত্যের বুলি আওড়াতে চাই,
দূর্ভিক্ষ তাতে আসবে জেনেও
পিছ পা হবার ইচ্ছা নাই
আমি হকের কথা বলতে চাই।
দেখিনা গালি সামনে বা পিছে
আমার তাতে কি যায় আসে।
আমি দূর্নীতিকে পরিহার করে,
সত্যের নীতি ছড়াতে চাই।
আমি হকের কথা বলতে চাই।
জানি অবসাদ হবে আপন সঙ্গী
নাই বা হলাম অবেগে বন্দী,
নীতির শ্লোগানে দূর্নীতিদের
প্রাসাদটা এবার ভাংতে চাই
আমি হকের কথা বলতে চাই।
পেটের পূঁজা বড় সাজা
দরকার ছিল আগে বুঝা,
আমি স্বার্থান্বেষী পেট পূঁজারীদের
কু-নীতির ফ্লাশ খুলতে চাই
আমি হকের কথা বলতে চাই।

---

* গ্রেজুয়েট, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।
** ১ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

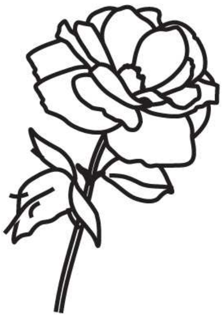

প্রেরণা
এনামুল হাসান রাকিব

কেদোঁনা হে প্রিয় মুছে নাও তুমি তোমার অশ্রুজল।
এ জগতে তুমি নাহি পাবে সুখ জগতের সবই ছল।
যত যাও তুমি অশ্রু ঝরায়ে সুখ নাহি ধরা দেবে।
অকারণে তুমি নিরলে বসিয়া অযথাই কেঁদে যাবে।
কাঁদিলে তোমার ঘুচিবেনা ব্যথা। বোঝা হবে শুধু ভারি।
বোঝা ভারি হলে জীবনের সাঁকো কি করিয়া দিবে পাড়ি।
জীবনের আজও বহু পথ বাকি চড়োনা ব্যাথার শুলে,
অগ্রের পানে চলো তুমি আজ পিছনের সব ভুলে।
সুখের চারা করো হে বপন। মনের এই উদ্যানে,
বিরহের মেঘ সরিয়ে হে প্রিয় জাগাও সুখের সূর্য
হৃদয়ে তোমার বাজিওনা আর বিরহের ঐ তুর্য।
কান্নার জলে ডুবায়ে রেখোনা তোমার ঐ বুক আর
ভুলিয়া বিষাদ বেদিয়া প্রমাদ খোল তব হিয়া দ্বার।
বিদুরিতে ব্যাথা পাইলে নির্জনে কভু বসি,
কাগজ সামনে রাখিয়া পারলে হস্তে ধরিও মসি
লেখনীর মাঝে করিও প্রকাশ মনের কষ্ট সব
খুশীর আলোয় তবেই তোমার আলোকিত হবে ভব।

জীবন মানে কি?
- শোয়াইব মাহমুদ

জীবন মানে কি?
জীবন মানে কি শুধুই জন্ম নেয়া? জীবন মানে কি মায়ের কোল ছেড়ে মাঠে-বনে দাপিয়ে বেড়ানো অনুসন্ধানী কোনো শার্লক হোমস? জীবন মানে কি ডিম লাইটের আলোয় দেখতে পাওয়া কোনো বইপোকা? জীবন মানে কি কৈশর আর তারুণ্যের চঞ্চলতা পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ?
জীবন মানে কি?
জীবন মানে কি যৌবনের উত্তাল সাগরে ছোট্ট কোনো ডিঙি নৌকা? জীবন মানে কি গভীর অরন্যে হারিয়ে যাওয়া ভ্রষ্ট কোনো পথিক? জীবন মানে কি সাহারায় হারানো তৃষ্ণার্ত কোন প্রাণ? জীবন মানে কি ঘাপটি মেরে থাকা শিকারির সেই অপেক্ষা? জীবন মানে কি নখের থাবায় ক্ষতবিক্ষত কোনো দেহ?
জীবন মানে কি?
জীবন মানে কি শীত-সকালে হান্দাছানা'র গুঞ্জন তোলা রোদঙ্গ কোন প্রেমিক?
জীবন মানে কি "..কুররাতা আ'য়ুন" বলে করা গোপন কোন প্রার্থনা?
জীবন মানে কি "হুন্না লিবাসুন লাকুম ওয়া আংতুম লিবাসুন লাহুন্না"য় শপথ নেওয়া এক জোড়া বাকবাকুম?
জীবন মানে কি "উহিব্বুকা ফিল্লাহ" বলে আঁকড়ে ধরা প্রিয়তমার আনন্দাশ্রু?
জীবন মানে কি?
জীবন মানে কি মৃত্যুশয্যায় তাহকিককৃত ইমাম মুহাম্মদের কোনো মাস'আলা? জীবন মানে কি "ইন্নাল্লাহা মা'আনা" ধ্বনিতে উজ্জীবিত ইমাম শামিলের কোনো বজ্র শপথ? জীবন মানে কি কন্সট্যান্টিপোলের দোরগোড়ায় মুহাম্মদ বিন ফাতিহ'র ক্রন্দনরত মোনাজাত?
জীবন মানে কি?
জীবন মানে কি শাইখুল হিন্দের "ওয়ালা তুশরিক বিহি শাইআ"র শিক্ষা? জীবন মানে কি জামে আযহারে ইবনে হাজারের দরদমাখা কোনো নসীহাহ? জীবন মানে কি ফিরদাউসের টংয়ে আবু বকর, ওমর আর নবিজীর সাথে গল্প করার কোনো স্বপ্ন?
জীবন মানে কি?
জীবন মানে কি?

* গ্রেজুয়েট, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।
** ৩য় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

আইআইইউসি হাদিস ক্লাব

সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

হাদিস ক্লাব কি?

সিলেবাস ভিত্তিক লেখাপড়ার পাশাপাশি সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন কো-কারিকুলার কার্যক্রমে দক্ষ করে গড়ে তোলার একটি চমৎকার প্লাটফরম আই আই ইউ সি হাদিস ক্লাব। IIUC Club Constitution এর আলোকে এটি গঠিত ও পরিচালিত হয়। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ক্লাবের কার্যক্রম সম্পূর্ণ আলাদাভাবে পরিচালিত হয়।

ক্লাবের কার্যক্রম ঃ

- ❑ কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা
- ❑ হিফজুল হাদিস প্রতিযোগিতা
- ❑ বক্তৃতা (বাংলা, আরবী ও ইংরেজী)
- ❑ বিতর্ক (বাংলা, আরবী ও ইংরেজী)
- ❑ কবিতা আবৃত্তি, ইসলামী সঙ্গীত
- ❑ নাটক প্রশিক্ষণ ও মঞ্চায়ন
- ❑ শিক্ষা সফর আয়োজন
- ❑ কালচারাল উৎসব
- ❑ প্রশিক্ষণ কর্মশালা
- ❑ খেলাধুলা ইত্যাদি আরও নানা আয়োজন।

ক্লাবের নির্বাহী কমিটি-২০১৯ ইং (ছাত্র)

প্রেসিডেন্ট	মুহাম্মদ নাজমুল হুদা
ভাইস প্রেসিডেন্ট -১	মোহাম্মদ বেলাল
ভাইস প্রেসিডেন্ট -২	চৌধুরী গোলাম মাওলা
জি.এস	ফয়সাল আহমদ
এ.জি.এস-১	মোঃ মোস্তাগফির বিল্লাহ
এ.জি.এস-২	হাফিজ উল্লাহ
বিতর্ক সম্পাদক	আব্দুল গাফ্ফার
সহকারী বিতর্ক সম্পাদক	আবু সালেহ মোহাম্মদ ইউসুফ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	শামসুদ্দিন
সহকারী সাংস্কৃতিক সম্পাদক	মো: রাকিবুল ইসলাম সরকার
পাবলিক রিলেশন সম্পাদক	মুহাইমিনুল কবির
সহ-পাবলিক রিলেশন সম্পাদক	শোয়াইব মাহমুদ
সহ-পাবলিক রিলেশন সম্পাদক	মো: আব্দুল গাফ্ফার হামীম
ক্রীড়া সম্পাদক	মো: মাহবুব উল্লাহ
সহকারী ক্রীড়া সম্পাদক	মাহমদুল হাসান

ক্লাবের তৎপরতা ও অর্জন

বিগত কয়েক বছর হাদিস ক্লাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ধারাবাহিকভাবে চ্যাম্পিয়ন, রানারআপসহ অসংখ্য সম্মানজনক পুরস্কার অর্জন করতে সক্ষম হয়।

ক্লাবের নির্বাহী কমিটি-২০১৯ ইং (ছাত্রী)

প্রেসিডেন্ট	ড. মোহাম্মদ আবুল কালাম
ভাইস প্রেসিডেন্ট	সাইয়্যেদ নুর
ট্রেজারার	মোহাম্মদ বেলাল
জি.এস.	সুমাইয়া খানম
এ.জি.এস-১	মারিয়া বিনতে ফারুক
এ.জি.এস-২	সাবেরা খানম
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	ওয়ারদাতুল আকমাম
বিতর্ক সম্পাদক	জুবাইদাতুন্নাহার পান্না
পাবলিক রিলেশন সম্পাদক	উম্মে রুম্মান
ক্রীড়া সম্পাদক	সুমি আক্তার

যোগাযোগ :

ই-মেইল : hadithclub.iiuc@gmail.com

ফেসবুক : www.facebook.com/shis.iiuc/

ওয়েবসাইট : www.iiuc.ac.bd/shis

ফটো গ্যালারি

'হাদিস চর্চা : প্রেক্ষিত চট্টগ্রাম' শীর্ষক সেমিনারের একাংশ

'বাংলাদেশে গৃহকর্মী নির্যাতন' শীর্ষক সেমিনারে মাননীয় প্রো.ভি.সি. প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলী আজাদী

বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য হাদিস বিভাগের স্কলারশিপ প্রাপ্ত ছাত্রদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

শরীয়াহ্ অনুষদ কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে মাননীয় ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর আব্দুল মান্নান

নবীন বরণ অনুষ্ঠান : অটাম ২০১৮ ইং

নবীন বরণ অনুষ্ঠান : স্প্রিং ২০১৮ ইং

বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ত: বিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার হাতে হাদিস ক্লাবের ফিমেল সেকশন

আন্ত: বিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় হাদিস ক্লাবের বিজয়ীদের পুরস্কার গ্রহণ

হাদিস বিভাগের ছাত্রীদের কাপ্তাই ট্যুর ২০১৯ইং

ছাত্রীদের খাগড়াছড়ি শিক্ষাসফর ২০১৮ইং

হাদিস বিভাগের ১ম ব্যাচের বিদায় অনুষ্ঠান

৩য় ব্যাচের বিদায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
প্রফেসর ড. দেলোয়ার হোসাইন

৪র্থ ব্যাচের বিদায় অনুষ্ঠানের একাংশ

হাদিস বিভাগের ছাত্রীদের বিদায় অনুষ্ঠান ২০১৮ ইং

হাদিস ক্লাবের ফুটবল টীম

হাদিস ক্লাবের নাট্যদল

হাদিস বিভাগের সামনে কয়েকজন শিক্ষকের সাথে
৪র্থ ব্যাচের শিক্ষার্থীবৃন্দ

হাদিস ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮ ইং

চট্টগ্রাম টু সেন্টমার্টি শিক্ষাসফর ২০১৮ ইং

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে হাদিস
বিভাগের মানববন্ধন

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ সমাবর্তনে উপস্থিত তৎকালীন
মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ও অতিথিবৃন্দ

হাদিস বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত "ই রিসোর্চ ইনফরমেশন
লিটারেসি" শীর্ষক কর্মশালা

'হাদিস স্টাডিজ' প্রথম সংখ্যার প্রকাশনা উৎসবে অতিথিবৃন্দ

প্রথম সংখ্যার প্রকাশনা উৎসবে উপস্থিতির একাংশ

হাদিস স্টাডিজ। সংখ্যা ০২। সাল ২০১৯ ইং। মূল্য ৫০ টাকা